বাঙ্‌লায়
ঊনবিংশ শতাব্দীর মানবতাবাদ
ও
নবজাগরণ

সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

BANGLAY'A
UNABINSHA SATABDIR MANABATABAD
O
NABAJAGARAN

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া, ১৩৬৩

প্রকাশক
শ্রীমতী ছবি রায়চৌধুরী
পিরামিড প্রকাশনী
১৮৩/৪ বি. বি. চ্যাটার্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০৪২

প্রচ্ছদ
ডক্টর তৃপ্তি ব্রহ্ম

মুদ্রাকর
তাপস সাহা
তরুণ প্রিন্টার্স
২৯ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

বাঁধাই—গীতা বাইন্ডিং ওয়ার্কস
২৭/১ এ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রাপ্তিস্থান—(১) ফার্মা কে. এল. এম (প্রাঃ লিঃ)
২৫৭ বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

(২) শ্রীঅমিয় বসু
বসু বুক ষ্টল
১০ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

(৩) রেণেসাঁ পাবলিসার্স
কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নি বে দ ন

বুদ্ধিজীবী মহলে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার নবজাগরণের প্রেক্ষিতে মানবতাবাদ (Humanism) নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক, ভাবনা ও সিদ্ধান্ত অতীতে অনেক হয়েছে এবং বর্তমানেও হয়ে থাকে। কাজেই এই অনেক আলোচিত বিষয়বস্তুর উপর নতুন করে আলোচনা করার কি আছে? এই প্রশ্ন হয়ত কেউ কেউ তুলতে পারেন এবং তা হবে স্বাভাবিকই। এখানে আমার বক্তব্য বা উত্তর খুবই সংক্ষিপ্ত। উক্ত বিষয়বস্তু অর্থাৎ মানবতাবাদ নিয়ে আলোচনা প্রায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হয়েছে ভাববাদীর (Idealia-lism) দৃষ্টিকোণ থেকে। কাজেই এই ধরণের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনায় পুনরাবৃত্তির প্রবণতা থাকবেই। কিন্তু আমি আলো-চনা কোরতে চেয়েছি উপরোক্ত বিষয়বস্তুকে Materialist বা জড়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। এই কোণ থেকে আলোচনা একেবারে হয়নি তা নয়। প্রয়াত বিনয় ঘোষ মহাশয়ের 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' অনেকটা এই দৃষ্টিকোণ থেকে লিখিত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মানবতাবাদ নিয়ে সামগ্রিকভাবে আলোচিত হয়েছে কিনা আমার জানা নেই।

আমি বেশ কয়েক বছর ধরে নানা পত্র-পত্রিকায় উল্লিখিত দৃষ্টিকোণ থেকে মানবতাবাদকে বিচার বিশ্লেষণ কোরতে চেয়েছি। আমার অনেক শুভার্থী বন্ধু এই বিষয়টিকে গ্রন্থবদ্ধ দেখতে চান। আলোচ্য প্রয়াস আমার, উপরোক্ত অনুরোধ রক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ।

আমার এই প্রচেষ্টা, ভবিষ্যতে (মুদ্রিত হওয়ার পর) সুধী সমাজে যদি সামান্যতম বিতর্কের সূচনা কোরতে সক্ষম হয় তাহলে নিজেকে ধন্য মনে কোরব।

সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

শ্রীসুনীল কুমার বন্দোপাধ্যায় রচিত বাঙলায় উনবিংশ শতাব্দীর মানবতাবাদ ও নবজাগরণ বইটি প্রকাশের আগে পাণ্ডুলিপিটি পড়তে পেয়ে আমার ভাল লাগে এবং আমি স্বতঃ-প্রবৃত্তভাবে নিজদায়িত্বে সামান্য কিছু বই প্রকাশ করে লেখকের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি।

গ্রন্থকার শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের যোগাযোগ সাহিত্য-সংস্থার একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক এবং তাঁর কর্মতৎপরতায় মুগ্ধ হয়ে সংস্থার অনেকেই এই বইটি প্রকাশের আগ্রহ প্রকাশ করাতে আমি একাজে ব্রতী হই। পাঠকবর্গ খুশীহলেই আমিও খুশী হবো।

প্রকাশিকা

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত বর্তমান প্রকাশিত এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখে আমার ভাল লেগেছিল খুবই এবং এর প্রকাশের আশায় ছিলাম এইকারণেই যে প্রকাশ হলে সুধী পাঠকদের কাছে এই গ্রন্থ খুবই প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান হবে, বাঙলায় উনবিংশ শতাব্দীর মানবতাবাদ ও নবজাগরণের পক্ষে সম্যগ্‌ স্বরূপ অবগত হতে। শুধু তাই নয় এর মূল্যমানের নিরীখে বাংলার সাহিত্য ও জীবনচর্য্যায়, বিশেষকরে ধর্মবোধে যে মানবতাবাদী জাগরণ এসেছিল তা ইউরোপের নবজাগরণের তুল্যমূল্য।

একদিকে ব্যক্তিমানস ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ, অন্যদিকে প্রভুতন্ত্র বনাম শাসনযন্ত্র সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে প্রয়োজনের তাগিদেই। প্রজন্মের কুসংস্কার ও তমসা ভেদ করে মানবতাবাদটি ব্রাহ্মমুহূর্তের রক্তিমাভায় দিগন্তে শিশু সূর্য্যের মতই ফুটতে সুরু করেছিল উনবিংশ শতাব্দীর আঙিনায়। কর্তাভজা নামক মনোবৃত্তি যা প্রায় দাস করে রেখেছিল মানুষকে, তাই, এই শতাব্দীতে নবজাগরণ ঘটিয়ে উদিত সূর্য্যের মতই ঝলক দিয়েছিল বাঙলার সাহিত্য—সংস্কৃতি ক্ষেত্রে। শুধুমাত্র, মানবতাবাদী রামমোহন মধুসূদন, ডিরোজিও, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নয়, এর ঢেউ সুদূর প্রসারী হয়ে ধর্মচচার জগতেও আলোড়ন তুলেছিল। বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কুষ্টিয়ার লালন একজন সুফীদীন সাধক হয়েও আপন সঙ্গীত রচনার মধ্যে সাহিত্যকীর্তি রেখে গেছেন সেই একই মানবতাবাদী নবজাগরণের প্রশ্রেই। আশাকরি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থ সুধীসমাজে সমাদৃত হবে।

ডঃ তৃপ্তি ব্রহ্ম

উৎসর্গ

স্নেহের ঊর্মিমালা চক্রবর্তী

ও

কল্যাণীয় নিতাই চক্রবর্তীকে

উনবিংশ শতাব্দীর মানবতাবাদ

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতবর্ষের রেনেসাঁ বা নবজাগরণের বিষয় আলোচনা করতে গেলে অনিবার্যভাবে এসে পড়ে মানবতাবাদের কথা। মানবতাবাদ শব্দটি অধুনা নানাস্থানে, নানাভাবে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে এবং অনেক সময়েই অত্যন্ত শ্লথভাবে, যথেষ্ট সতর্ক না হয়েই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অনেকে মানবিকতার সঙ্গে মানবতাবাদকে মিশিয়ে ফেলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন। মানবতাবাদের Connotation যে মানবিকতার ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্ন চরিত্রের, সে কথা অনেক সময়েই আমরা ভুলে যাই।

মানবতাবাদের প্রথম আবির্ভাব মধ্যযুগের ইউরোপের নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে। মধ্যযুগের নবজাগরণের সঙ্গে মানবতাবাদ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, একটিকে বাদ দিয়ে আর একটিকে কল্পনা করা যায় না। কাজেই বাঙলার নবজাগরণ ও মানবতাবাদকে উপলব্ধি করতে গেলে ইউরোপের নবজাগরণ ও মানবতাবাদকে বুঝতে হবে।

মানবতাবাদের ইমারত দাঁড়িয়ে আছে, মোটামুটি বলতে গেলে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের উপর। ব্যক্তি মানুষের যে একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তাকে সমষ্টির খেয়ালখুশির যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া চলে না, এই সত্য নবজাগরণের হোতারা পোপ-অধ্যুষিত ইউরোপের মানুষের দৃষ্টিগোচর করলেন তত্ত্ব ও যুক্তির সাহায্যে। সামন্ততান্ত্রিক ইংলণ্ডে ও ইউরোপে ঈশ্বরের প্রতিভূ রাজা ও মানুষের পরিত্রাতা মহান পোপের অপবিত্র চুক্তি (Unholy alliance) ব্যক্তিমানুষকে প্রায় খেলার পুতুল করে তুলেছিল—

তার ছিল না কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। সমষ্টিবাদী অহমিকা (collective ego) ব্যক্তির উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে তার প্রাণশক্তি হরণ করে চলেছিল দিনের পর দিন। পোপের সমর্থন দ্বারা পরিশুদ্ধ রাজার হুকুমনামার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি চলত না। পোপের ইচ্ছাতেই ব্যক্তিমানুষের স্বর্গের চাবিকাঠি কেনা যেত কিছু অর্থের বিনিময়ে। অনাচারী সামন্ততন্ত্র ও ব্যাভিচারী চার্চ যখন ব্যক্তিমানুষকে দুর্দশার শেষ স্তরে নিয়ে এসেছিল মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপে, সেই সময় বিপ্লবের পদধ্বনি শোনা গেল। ধ্রুপদী-সাহিত্য ও শাস্ত্রের পঠন ও পাঠন তৎকালীন বুদ্ধিজীবী সমাজের অস্বচ্ছতা দূর করল— বুদ্ধিজীবীরা তৎকালীন সমাজ, রাষ্ট্র ও কর্মনৈতিক ব্যবস্থাকে নতুনভাবে যাচাই করার অবকাশ পেল। তাঁরা বুঝলেন, মানুষকে কুয়াশা ও অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসতে গেলে ব্যক্তি-সত্তাকে জাগ্রত করতে হবে। ব্যক্তিমানুষের জাগরণই ইউরোপীয় সমাজের জাগরণ, যার ফরাসী প্রতিশব্দ রেনেসাঁ।

ব্যক্তিমানুষের স্বাতন্ত্র্যের এই স্বীকৃতি একদিকে সমষ্টিবাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানানো, অন্যদিকে মানবতাবাদের ভিত প্রস্তুত করানো। এখন দেখা যাক তৎকালীন ইউরোপীয় মানবতাবাদের বৈশিষ্ট্য ও উপাদান কি। ব্যক্তিমানুষের স্বীকৃতির উপর মানবতা-বাদ দাঁড়িয়ে। ব্যক্তিমানুষের স্বীকৃতির অর্থ কি? স্বীকৃতির অর্থ হোল ব্যক্তিমানুষ তার নিজের ভালমন্দ বোঝার অধিকারী। এজন্য কোনো এজেন্ট বা মধ্যশক্তির প্রয়োজন নেই। ব্যক্তি তার অন্তর্নিহিত (Inner) যুক্তিবাদের সাহায্যে তার নিজের ভাল-মন্দের বিচারে সক্ষম। উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া যদি কোনো নির্দেশ (রাজশক্তি বা ধর্মগুরু—যাই হোক না) তার যুক্তির পরিপন্থী হয়, তাহলে সে নির্দেশ সে পালন করতে বাধ্য নয়। মানসিক ও দৈহিক (Biological) গঠনের দিক থেকে মানুষ জন্মগতভাবে

যুক্তিপ্রবণ—সে যাচাইয়ে সক্ষম, জন্মগত যুক্তিবাদ ও অনুসন্ধিৎসার সাহায্যে ব্যক্তিমানুষ দেহ ও মনে বৃদ্ধি পায়, যেমন বৃদ্ধি পায় বিভিন্ন জাতি (জাতি তো ব্যক্তিমানুষেরই সমষ্টিমাত্র) রেনেসাঁর পুরোধারা—ব্যক্তিমানুষের এই অনুসন্ধিৎসার (Spirit of enquiry) উপর জোর দিলেন। ব্যক্তিমানুষ যুক্তিবাদী হিসাবে যে কোনো Hypothesis বা গৃহীত সত্যকে যাচাই করার অধিকারী—এই তত্ত্ব তাঁরা ব্যক্তি ও সমাজের কাজে তুলেই ধরলেন। এই তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে মার্টিন লুথার পোপের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে যেহাদ ঘোষণা করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। অন্যদিকে ইরাস্‌মাস্‌ ব্যক্তি-মানুষের অন্তর্নিহিত যুক্তিবাদী সত্তার উপর জোর দিয়ে স্বীয় বক্তব্যকে জোরদার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ব্যক্তিমানুষের মতো এক জাতি এক রাষ্ট্রের ধারণাও এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ থেকে প্রেরণা পেয়েছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজারা, বিশেষ করে ইংলণ্ড ও শতধাবিভক্ত জার্মানীর খণ্ড খণ্ড রাজ্যগুলি পোপের সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করে জাতিভিত্তিক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র (পোপ প্রভাব মুক্ত) গঠনে মনোযোগী হয়েছিল। নতুন প্রকৃতির রাষ্ট্রে নতুন ধর্ম প্রোটেস্ট্যান্টবাদ পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যক্তি-মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পেল।

ব্যক্তিমানুষ কেবল পোপ ও রাজার ক্ষমতাকেই চ্যালেঞ্জ জানায়নি, প্রতিটি গৃহীত সত্যকে (Hypothesis) নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত হল—অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে বলে "Spirit of enquiry" তাই হোল—তৎকালীন প্রজন্মের কুসংস্কার ও কর্তাভজা মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জোরদার হাতিয়ার।

এই হাতিয়ার শাণিত হয়েছিল যুক্তিবাদের পাথরে—অর্থাৎ যে তথ্য বা তত্ত্ব যুক্তিবাদের কষ্টিপাথরে টেকেনি, তাই-ই বাতিল হয়ে গেল তৎকালীন নবজাগ্রত বুদ্ধিজীবীদের কাছে। এছাড়া এই বুদ্ধিজীবীদের একাংশ জড়বাদকে যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করলেন—

ফলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া গেল এঁদের অনেকের জীবনচর্যায়। পৃথিবীর বা বিশ্বের সব কিছু আধিভৌতিক বা দৈবশক্তির ইচ্ছার ফল, জড়বাদে দীক্ষিত অনেক বুদ্ধিজীবী—তা স্বীকার করলেন না। তাঁরা ঘটনা ও গৃহীত সত্যগুলিকে গবেষণাগারের বিষয়বস্তু করে তুললেন। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ভারতবর্ষে মধ্যযুগের অনেক আগে অর্থাৎ হিন্দুযুগে জড়বাদী দর্শনের ভিত প্রস্তুত হয়েছিল চার্বাকী মতবাদের মাধ্যমে। যাই হোক যদিও জড়বাদ দর্শন হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর আগে ঠিক সুষ্ঠুরূপ পরিগ্রহ করেনি, কিন্তু অনুসন্ধিৎসা ও বাস্তবমুখিতা ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবী অনেককেই বুদ্ধিজীবী হতে সাহায্য করল।

মধ্যযুগের ইউরোপে ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানবতাবাদের প্রধান উপাদান, তা হলে, দেখা যায় অনুসন্ধিৎসা, বাস্তবমুখীনতা, গৃহীত সত্যকে চ্যালেঞ্জের প্রবণতা ব্যক্তিমানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি। কিন্তু জড়বাদ বুদ্ধিজীবীদের কাছে পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে ধরা না দেওয়ায় মধ্যযুগের ইউরোপীয় মানবতাবাদ একটি ত্রুটিহীন স্বয়ংসম্পূর্ণ দর্শন হিসাবে সবগ্রাসী হয়ে দেখা দেয়নি। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে মানবতাবাদই ইউরোপের রেনেসাঁকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। ফলে ব্যক্তিমানুষের একটি সার্বিক উন্নতির জোয়ার সমস্ত প্রতীচ্য ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই জোয়ারের প্রভাব কিন্তু দেরীতে হলেও ভারতবর্ষের উপকূলে ঢেউ তোলে। এই ঢেউ সর্বপ্রথম আসে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলায়।

এখন দেখা যাক ইউরোপের রেনেসাঁ আশ্রিত মানবতাবাদ বাঙলার মাটিতে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাঙলার নবজাগরণের জনক রাজা রামমোহনের জীবনচর্যায় মানবতাবাদের প্রথম লক্ষণ পরিচ্ছন্নভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। রামমোহন ধ্রুপদী-সাহিত্যের দ্বারা নিজেকে সুরক্ষিত ও সুসংস্কৃত করে অনেক গৃহীত সত্যকে এমনভাবে চ্যালেঞ্জ জানালেন যে, যরে ফলে

অনেক কালের ধ্যান-ধারণা ও ঐতিহ্যের মূলে নিদারুণ আঘাত পড়ল। তাঁর বেদান্তের বৈপ্লবিক ভাষ্য চিরাচরিত ধারা থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এই কাজের মধ্যে রামমোহনের একটি যুক্তিবাদী বাস্তবমুখীন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন পাওয়া যায় তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদের মধ্যে। তাঁর বেদান্তের এই নতুন ভাষ্যের ফলেই ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটল, যেমন লুথারের বিদ্রোহের ফলে প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের উৎপত্তির পেছনে কাজ করেছে সমাজকে আমূলভাবে পরিবর্তিত করে প্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার অভীপ্সা। সমাজ-সংস্কারের মনোবৃত্তিই ছিল ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের আসল পরিচালন শক্তি। রামমোহনের ব্যক্তিমানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল বলেই অচলায়তন সমাজকে বারে বারে আঘাত হানার চেষ্টা করেছিলেন।

রামমোহনের সমসাময়িক ফিরিঙ্গি ডিরোজিওর মধ্যে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী আরও পরিস্ফুট। প্রবল অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে প্রতিটি বিষয়ে সংশয়ী দৃষ্টিভঙ্গী তার যুক্তিবাদী মনেরই পরিচায়ক। ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যেরা কোনো গৃহীত সত্যকে যাচাই না করে কোনদিন গ্রহণ করেন নি। যখনই কোনো তত্ত্ব, যুক্তিধোপে টেকেনি, তখনই তাকে পরিত্যাগ করেছেন নির্মমভাবে, ঐতিহ্যের প্রতি মমতা না দেখিয়ে; এবং এই জন্যই ডিরোজিওর ইয়ংবেঙ্গল দলকে বাঙলার সমাজ বিপ্লবের অগ্রদূত বলা চলে। হয়ত এই সব বিদ্রোহী তরুণদের ব্যবহারে কিছু আতিশয্য ছিল, কিন্তু তাঁরা যে ব্যক্তিমানুষের মধ্যে একটা যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ বা দ্বিমত থাকতে পারে না। এই গোষ্ঠির অনেকের, বিশেষ করে তাঁদের গুরু ডিরোজিওর চিন্তায় জড়বাদী দর্শনের একটা রূপরেখার সন্ধান পাওয়া যায়। যদিও তা একটি নির্দিষ্ট রূপ নেয়নি, এবং এর কারণ কার্ল মার্কসের আবির্ভাবের পূর্বে

জড়বাদ সুষ্ঠু দর্শন হিসাবে চিন্তাজগতে স্থান করে নিতে পারে নি। কার্ল মার্কসই সর্বপ্রথম জড়বাদের মূলে একটি Logic খাড়া করে একে দর্শনের মর্যাদা দিলেন। যাই হোক, ডিরোজিওর সংশয়ী দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে তৎকালীন শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহ বেড়ে গেল। ব্যক্তিমানুষের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেল—সে যে অদৃশ্য শক্তির হাতে খেলার পুতুল নয়—এই অবস্থা তাকে শক্তি যোগাল। মানবতাবাদ এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে অনেকটা এগিয়ে গেল।

ডিরোজিওর পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর আরো দৃঢ়তর রূপের পরিচয় পাওয়া গেল। কট্টর যুক্তিবাদী বিদ্যাসাগর রামমোহন থেকে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। বেদান্তদর্শনের মায়াবাদ ভারতবাসীর প্রগতির পক্ষে ক্ষতিকারক বা অন্তরায়, এ সত্য তিনি সোচ্চারে ঘোষণা করতে পেছু-পা হলেন না। দর্শনের পাঠক্রমে বেদান্তপঠনকে বাদই দিতে সুপারিশ করলেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর নীরবতা তাঁর সংশয়বাদী দৃষ্টিকোণেরই পরিচায়ক। Spirit of enquiry বা যাচাই করার স্পৃহা অত্যন্ত গভীর থাকায় ঈশ্বররূপ Hypothesisকে বিদ্যাসাগর যুক্তির আলোয় পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করতে পারেননি এ কথা তাঁর জীবনচর্যা থেকেই প্রতীয়মান হয়। বিদ্যাসাগরের যুক্তিবাদ তাঁকে অনেকরূপে বিজ্ঞানমুখী করে তোলে। ফলে, তিনি প্রতীচ্যের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উপর বিশেষ জোর দেন, সংস্কৃত ও প্রাচ্য শাস্ত্রের পণ্ডিত অধ্যাপক হয়েও। ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যেও ডিরোজিওর মতই জড়বাদ গ্রহণ প্রবণতা দেখা যায়। উভয়ের সংশয়বাদী দৃষ্টিকোণের মধ্যে নিহিত রয়েছে জড়বাদী প্রবণতার মূল। এদিক থেকে বিচার করলে রামমোহন ও সমসাময়িক আরো অনেকের তুলনায় দুজনেই মানবতাবাদকে তাঁদের নিজেদের জীবনচর্যায় গ্রহণ করেছিলেন নিজেদের অজ্ঞাতসারেই।

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মধ্যে মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণের আভাষ পাওয়া যায়। ভারতীয় চলতি ঐতিহ্যের মূলে আঘাত করে একদিকে যেমন তিনি বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন, অন্যদিকে মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে তার যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য তাঁর এই প্রয়াসের বাস্তব রূপায়ণ। যেমন রূপায়ণ বীরাঙ্গনা কাব্যগুচ্ছ। অনুসন্ধিৎসা-স্পৃহা ও বাস্তবমুখীনতা না থাকলে এই মহাকবি এত বেশী বাস্তবমুখী হতেন না ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী নায়ক নায়িকাদের তাঁর কাব্যে চিত্রিত করতে গিয়ে। তিনি সংশয়বাদী ছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর যে কোনো আনুগত্য ছিল না, খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রহণ সত্ত্বেও তা প্রমাণিত হয় তাঁর জীবনচর্চার ধরণ থেকে — জড়বাদকে জীবনে ওতঃপ্রোতভাবে গ্রহণ না করলেও।

পূর্বেই বলেছি, উপাদান হিসাবে জড়বাদ উপরোক্ত মানবতাবাদীদের জীবনে খুব বড় হয়ে না উঠলেও এদের অনেকের দৃষ্টিকোণেই জড়বাদী প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়, বিশেষ করে বিদ্যাসাগর ও ডিরোজিওর ক্ষেত্রে। তাই মধ্যযুগের ইওরোপের মানবতাবাদে আগের যে অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করেছি বাঙলায় রেনেসাঁর পুরোধাদের মধ্যে তা অনেক পরিমাণে দূরীভূত দেখি, সম্পূর্ণভাবে না হলেও। মার্কসের আবির্ভাবের পর উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েক দশক থেকে তাঁর প্রভাব ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। তার ফলে জড়বাদ দর্শন হিসাবে একটি সুষ্ঠু রূপ নিয়েছে। কাজেই আশা করা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর মানবতাবাদের মধ্যে উপাদানঘটিত যে অসম্পূর্ণতা বিদ্যমান ছিল, সেই অসম্পূর্ণতা দূর হয়ে যাবে, মানবতাবাদকে যদি নৈতিকভাবে জড়বাদীদর্শনের উপর খাড়া করা যায়। বর্তমান পৃথিবীতে দর্শনের ক্ষেত্রে মার্কসের সবচেয়ে বড় অবদান হোল তাঁর জড়বাদ

(দ্বন্দ্বমূলক জড়বাদ নয়) তাঁর সর্বহারার স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদ ঐতিহাসিক অনিবার্যতাবাদ নয়। মানবতাবাদ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দর্শন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, যদি এই জড়বাদী দর্শন যুক্তিবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে পারে।

মানবতাবাদের একটি সাধারণ রূপরেখার পরিচয় দেওয়া গেল। এখন দেখা যাক মানবিকতা কি। যে মানুষ মানুষকে সাধারণভাবে ভালবাসে, ব্যক্তিমানুষ বা মানবগোষ্ঠী বিশেষের প্রতি সমত্ববোধ করে, সহানুভূতিশীল হয় তার দুঃখ ও বেদনায়, আমরা তাকে বলব মানবিক মানুষ (Humane man)। কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের অনেকের মধ্যেই এই মানবিকতা বোধ দেখা যায়। কিন্তু তাদের এই মানবিকতা নির্দিষ্ট কোন দর্শনের উপর দাঁড়াবে, এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু মানবতাবাদকে একটা দর্শন হিসাবে খাড়া করার প্রয়াস চলেছে বর্তমান পৃথিবীতে। বিপ্লবী চিন্তানায়ক মানবেন্দ্রনাথের নয়া মানবতাবাদ এই প্রয়াসের শ্রেষ্ঠ নজীর। নয়া মানবতাবাদ নিয়ে এখানে আমি কোনো আলোচনা করব না। এখানে শুধু এইটুকুই বলব যে, পূর্বে মানবতাবাদের যে উপাদানগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি সেগুলির পূর্ণমাত্রায় অস্তিত্ব রয়েছে নয়া মানবতাবাদের ধারণার মধ্যে। মানবতাবাদ যেখানে যুক্তিবাদের উপর ভিত গড়তে চলেছে, মানবিকতা সেখানে একটি মহান ভাবাবেগ (Noble sentiment) মাত্র, যা মানুষে মানুষে সম্প্রীতি গড়ে তোলে—মানব সমাজে একটা সুন্দর আবহাওয়া গড়তে সাহায্য করে। মানবিকতাবোধ সম্পন্ন মানুষ বা শিল্পী যে সব সময় মুক্ত মানুষ হবে, এমন কথা নেই। সে হয়ত অনেক সময়েই চলতি সংস্কারকে কাটিয়ে উঠতে পারে নি—সে হয়ত সামাজিক সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে নেয়—তবু সে ব্যক্তিমানুষ যে সমাজের জন্য ভাবে, কিছু সময় ব্যয় করে মানুষ ও সমাজের হিতার্থে।

কাজেই দেখা যায়, মানবিক হলেই মানবতাবাদী হতে হবে এমন কোনো কথা নেই, যদিও মানবতাবাদী মানবিক হয়ে থাকে।

বাঙলার নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ প্রসূন এক বিরাট মানুষ ও প্রতিভা, যিনি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এসে বিশ্বস্বীকৃতি পেলেন। তিনি কবিগুরু ও বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ। এই বিরাট মানবিকগুণসম্পন্ন বিশ্বপ্রেমিকটিকে কি মানবতাবাদী বলে বর্ণনা করা যায়? মধ্যযুগীয় মানবতাবাদ অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার মানবতাবাদের আওতায় যথার্থই কি আমরা তাঁকে টেনে আনতে পারি? রবীন্দ্রনাথ যুক্তিবাদী (Rationalist) ছিলেন না, একথা আমরা বলতে পারি না। কিন্তু কট্টর যুক্তিবাদ হিসাবে 'Spirit of enquiry'-র দ্বারা চালিত হয়ে তিনি কি গৃহীত সত্যগুলিকে (Hypothesis) চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন? রবীন্দ্রজীবন ও তাঁর সাগরগভীর সাহিত্য সেকথা বলে না। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতার ধারণা Rationalism-এর অনুপন্থী কি? রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা তাঁর নিছক কাব্যদেবতা নয়—'জীবনদেবতা' তাঁর জীবনেরই দেবতা। ঈশ্বরপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে গৃহীত সত্য বলে স্বীকার করেছেন। তাঁর ধারাবাহিক কাব্যের মাধ্যমে এই সত্যই বারে বারে বিভিন্ন পর্বে, বিভিন্ন যুগে ঘোষণা করে এসেছেন। কবির জীবনে অনেক সংকট, অনেক ঝড়, অনেক মৃত্যু এসেছে, কিন্তু কখনই তিনি সংশয়বাদী হয়ে উঠেন নি। জীবনের শেষ মুহূর্তে মৃত্যু বিষয়ক দুই একটি কবিতা বাদ দিলে জীবনবোধ তাঁর ঈশ্বরপ্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ। সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে কবিজনোচিত মনে ভাবাবেগেরই পরিচয় রয়েছে তাঁর কাব্য ও জীবন সাধনায়—যুক্তিবাদে নয়।

অন্যদিকে ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক রবীন্দ্রনাথের জীবনে জড়বাদের কোনো স্থান ছিল না। তাঁর কাছে সমস্ত কিছুই ছিল এক চৈতন্যময় পরমসত্তার প্রকাশ—জড়ের মধ্যেও

চৈতন্যের অস্তিত্ব তাঁর কাছে গৃহীত সত্য, যা তাঁর বিভিন্ন কবিতা ও সাহিত্যকর্মে বার বার রূপায়িত হয়েছে। ভাববাদী দর্শনের এই হোল মূল কথা, যা হেগেলের সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিভিন্নরূপে ভাববাদী চিন্তানায়কদের প্রভাবিত করেছে যুগ যুগ ধরে। কাজেই জড়বাদ—রবীন্দ্রভাবনার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী মতবাদ। অথচ মানবতাবাদ, জড়বাদ, বিচ্যুত হলে দর্শন হিসাবে হয়ে পড়ে অসম্পূর্ণ। তাই যে অর্থে ডিরোজিও ও ঈশ্বরচন্দ্র মানবতাবাদী (সম্পূর্ণভাবে না হলেও) রবীন্দ্রনাথ সে অর্থে মানবতাবাদী ছিলেন না, মানবিক হৃদয় ও মন নিয়েও। রবীন্দ্রনাথ ভিক্টোরীয় উদারতাবাদের যুগের মানুষ, সামন্ত-তান্ত্রিক আবহাওয়ায় মানুষ হলেও। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সামন্ততান্ত্রিক হলেও ইংলণ্ডের ভিক্টোরীয় উদারতাবাদ, যা তৎকালীন বুর্জোয়া সভ্যতায় শ্রেণী অবদান, তার ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের নগর ও বন্দরে। ফলে এক ধরনের মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথমার্ধে এবং তিনি সমস্ত জীবন ধরে এই মিশ্র সংস্কৃতির ফসল তুলে জীবনের ভাণ্ডার ভরে তুলেছিলেন। তাই মানবতাবাদী না হলেও মানবিকতাবোধ তাঁর জীবনকে করে তুলেছিল সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়, যা সাধারণের মনে ধারণা জন্মায় যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মানবতাবাদী। আজ রবীন্দ্রনাথের যথার্থ মূল্যায়ণ করতে হলে এই ধারণার অবসান ঘটাতে হবে। রবীন্দ্রনাথকে মানবতাবাদী আখ্যায় ভূষিত না করলেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এতটুকু হ্রাস পাবে না, কট্টর রবীন্দ্রভক্তরা দুঃখিত হলেও।

মানবতাবাদী রাজা রামমোহন

উনিশ শ বাহাত্তরের মে মাসে নব্য বাঙলার স্রষ্টা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মের দ্বিশত বৎসর পূর্তি উৎসব সুরু হয়েছিল, এবং এর জের চলেছিল উনিশ শ চুয়াত্তর সালের মে মাস পর্যন্ত অর্থাৎ পাকা দু'বৎসর ধরে—কারণ জন্ম সাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য। এক দলের মতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে হলো রাজা রামমোহনের আবির্ভাবের বৎসর, আর এক দল যাঁদের পুরোধা হলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ-কেই রামমোহনের জন্ম বৎসর বলে নির্ধারণ করেছেন। কোন্‌টি ঠিক, আর কোনটিই বা বেঠিক সে বিতণ্ডার মধ্যে আমরা যাব না, অবশ্য এই বিতর্কের অবকাশে উৎসবের দীর্ঘস্থায়িত্ব নিতান্ত অবাঞ্ছিত নয়। কারণ, এই জন্মোৎসবকে কেন্দ্র করে রামমোহনের যথার্থ মূল্যায়ন করার অধিকতর ও ব্যাপকতর প্রয়াস পেলেন বাঙলা তথা ভারতের শিক্ষিত সমাজ। কখন আল্‌গাভাবে, কখন বৈঠকীচালে ও মেজাজে আমরা রামমোহনকে নব্য বাঙলার স্রষ্টা হিসাবে আখ্যায়িত করি বটে, কিন্তু সে আখ্যানের পেছনে কতখানি যুক্তি রাখতে পারি, সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। কারণ অনেক সময়েই আমরা অনেক বিষয়েরই গভীরে যেতে অনীহা বোধ করি, ধৈর্যের ও স্থৈর্যের অভাবে। অথচ ভারতবর্ষের চিন্তা জগতের বর্তমান নৈরাজ্যে মানসিক বিশৃঙ্খল অবস্থায় রামমোহনকে নতুনভাবে স্মরণ করা বিশেষ প্রয়োজন, যদি যথার্থভাবে ভারতের আত্মাকে জাগাতে হয়।

বর্তমান ভারতের ভাব বিশৃঙ্খলার কথা বল্‌তে গেলেই নিজে-দের অজ্ঞাতসারেই রামমোহনের আবির্ভাবের কালের সমাজ ও

সংস্কৃতির চেহারা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এই সময়ে ইংরেজ সামন্ততান্ত্রিক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে স্বীয় আসন ভারতবর্ষে কায়েমী করতে সবে সক্ষম হয়েছে, আর এই আসন সুরক্ষিত রাখার জন্য দৃঢ় মুষ্টিতে শাসন বল্গা ধরতে চলেছে—সহায়তা করছে সেই কাজে দেশীয় মানুষেরই একাংশ। তাই ইংরেজী শিক্ষার কিছু ছিটেফোঁটা ভারতীয়দের মধ্যে নিক্ষেপ করা যায় কিনা, সে বিষয়ে ইংরেজ শাসক চিন্তা করছে, এবং নিজ প্রয়োজনের তাগিদেই ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনার কথা নিতান্ত বাধ্য হয়েই ভাবতে হচ্ছে। ঠিক এই সময়েই রামমোহনের আবির্ভাব। যুক্তিনিষ্ঠ প্রগতিমনা রামমোহন ইংরেজের এই ভাবনাকে কার্যকরী করার জন্য হয়ে উঠলেন পরম উৎসুক। কারণ তিনি তাঁর আলোকলিপ্সু মন নিয়ে একথা বুঝেছিলেন যে, তৎকালীন বাঙ্‌লার তথা ভারতের তমসা ঘোচাতে গেলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ঘরের দরজা খুলে দিয়ে পাশ্চাত্যের আলো আর বাতাস নিয়ে আসা। তাই ইংরেজী শিক্ষাকে তিনি স্বাগত জানালেন, যখন অন্ধ অনাচার কুসংস্কারের মূলধনবৃদ্ধি করাকে পাণ্ডিত্যের মাপকাঠি বলে মনে করা হোত। রামমোহনের এই পদক্ষেপ নিশ্চয়ই বৈপ্লবিক বলে ধরে নিতে হবে। তিনি বুঝেছিলেন, দেশীয় মানুষের দুঃখ ঘোচাতে গেলে, তাদের মানুষের মর্যাদা দিতে হলে, প্রথম প্রয়োজন তাদের যথার্থভাবে শিক্ষিত করা—বৃহত পৃথিবীর সঙ্গে তাদের ঠিকমতো পরিচিত করানো। মানুষের ভালবাসার শাশ্বত মূল্যবোধের উপর গভীর আস্থা তাঁকে প্রবুদ্ধ করেছিল কেবল মানুষকে জড়তা থেকে মুক্তিতে নয়, পৃথিবীর মনুষ্য নামধারী প্রতিটি জীবের মুক্তি আকাঙ্খাকে শ্রদ্ধা জানাতে, সে মানুষ যে কোন জাতি, যে কোন দেশের হোক না কেন। ইউরোপ যখন 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' ধারণার বশবর্তী হয়ে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের নামে মানুষের মনকে পঙ্গু করে তুলেছিল, ঠিক

সেই সময়ে অনগ্রসর ও অন্ধকার ভারতবর্ষের এক মানুষ দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলো—মানুষ হিসাবে এক দেশের লোকের অন্য যে কোন দেশে স্বাধীনভাবে যাতায়াতের অধিকার নিশ্চয়ই আছে। আজকের দিনের, 'এক পৃথিবী'র (One world) স্বপ্ন যখন বেশ কিছু মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে আছে, তখনও এই স্বাধীন যাতায়াতের কথা ভাবা যায় না। ব্যক্তি মানুষের অধিকারের উপর কথাটায় শ্রদ্ধা থাকলে এমন বৈপ্লবিক বলা চলে। রামমোহনের এই চিন্তা তৎকালে বৈপ্লবিক হলেও, অভারতীয় ছিল না। প্রাচীন ভারত ও তার ঐতিহ্যে মানুষের সীমাবদ্ধতার (ভৌগলিক ও রাজনৈতিক) কথা ভাবা হয়নি। প্রাচীন ভারত মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখেছে, বিশেষ কোন ভৌগলিক বা জাতীয় গণ্ডীতে তার দৃষ্টি প্রতিহত হয়নি; যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ভারত স্বীয় দেহে স্বীয় প্রতিভায় আত্মীকরণ করেছে; বিভিন্ন জাতিকে মানুষের সমষ্টি হিসাবে গ্রহণ করেছে। এই মানবতাবাদী প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য রামমোহনের মানসিক গঠনের অন্তঃস্থলে কাজ করছিল।

যাই হোক, পাশ্চাত্য শিক্ষাকে হাতিয়ার করেই মানবতাবাদী যুক্তিনিষ্ঠ রামমোহনের অভিযান সুরু উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়া থেকেই। নানা রচনা, ইস্তাহার ও পুস্তিকার মাধ্যমে তিনি জনমানসকে শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিলেন তৎকালীন কুসংস্কার, কদাচার ও অন্ধ সমাজের ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে। সতীদাহ প্রথা ছিল বহুযুগ চালিত এমনই একটি বীভৎস কু-প্রথা—যে প্রথার আড়ালে খুঁজে পাওয়া যেত লোভী, নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর মানুষের অতি কুৎসিৎ মন—যে মন সামান্য বৈষয়িক লাভের জন্য পারলৌকিক পুণ্যের লোভ দেখিয়ে চিতার আগুনে পুড়িয়ে মারতো। কুসংস্কার ও স্বার্থপর এ এক অদ্ভুত সমন্বয়। এমনি অনেক কুসংস্কারের পেছনে কাজ করেছে যুগে যুগে মানুষের

লোভাতুর স্বার্থক্লিষ্ট মন যাকে উৎসাহিত করেছে, সমর্থন করেছে পুরোহিত শ্রেণীর মানুষেরা, নিজেদের সংরক্ষিত আসন সমাজে কায়েমী রাখতে। রামমোহনের বিদ্রোহ ছিল এই পুরোহিত-তন্ত্রের বিরুদ্ধে। তিনি জানতেন যে, এই তন্ত্রের দুর্গের উপর ঠিকমত আঘাত হানতে পারলে, ভেঙে পড়বে কুসংস্কারের অন্ধ-প্রাচীর যা সযত্নে রক্ষা করে মতলববাজ স্বার্থান্বেষীদের নানা প্রকারের স্বার্থ। ভারতবর্ষের পুরোহিততন্ত্র ছিল পৌত্তলিকতা-কেন্দ্রীয়, কাজেই এই কেন্দ্রের মূলে আঘাত করতে পারলে পুরো-হিততন্ত্রই নিদারুণভাবে আঘাত পাবে,—এ সত্য রামমোহন বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর প্রচারিত উপনিষদ-ভিত্তিক একেশ্বরবাদ পুরোহিততন্ত্রের ভিত সজোরে নাড়িয়ে দিল। ফলে, সনাতনী মহল থেকে তাঁর উপরে আক্রমণ এলো অতি তীব্র হয়ে। রামমোহন ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে বেদান্তসার পুস্তিকা রচনা করেন, বেদান্তের মূলসূত্র সাধারণের অবগতির জন্য এবং একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য। সনাতনীরা ক্ষিপ্র হয়ে উঠলো তাঁর ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের বিরুদ্ধে—সুনজরে দেখলো না তাঁর সমাজ সংস্কারের আন্দোলনকে। রামমোহনের বেদান্ত ভাষ্যের (যার উপর ভিত্তিজাত তাঁর একেশ্বরবাদ) প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিরুদ্ধে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁর প্রকাশিত বেদান্ত চন্দ্রিকার মাধ্যমে সজোরে প্রতিবাদ জানালেন। রক্ষণশীলেরা সতীদাহ প্রথা বজায় রাখার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গেলেন। কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠ মানবতাবাদী রামমোহনকে নিরস্ত করা গেল না। আচার ও আচরণ অপেক্ষা ব্যক্তিমানুষের কল্যাণ কামনাই ছিল তাঁর মজ্জায় মজ্জায় গ্রথিত।

রামমোহনকে ধর্মসংস্কারক হিসাবে পরিচিত করানো হলো এবং ব্রাহ্মসম্প্রদায়কে একটি নতুন ধর্মভুক্ত শ্রেণী ও তাঁকে সেই ধর্মসম্প্রদায়ের প্রথম ধর্মগুরু হিসাবে প্রচারের প্রয়াস হলেও

রামমোহন প্রকৃত পক্ষে নতুন কোন ধর্ম প্রবর্তন করতে ব্যস্ত ছিলেন না। তাঁর একান্ত ভাবনা ছিল—কেমন করে দেশের মানুষকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে যুক্তিনিষ্ঠ করে তোলা যায়। কেমন করে দেশকে নিয়ে যাওয়া যায় বাস্তব সমৃদ্ধির পথে। তিনি তার যুক্তিবাদী মন নিয়ে জানতে চেয়েছিলেন—বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্যসূত্র কোথায় নিহিত এবং এই উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন ধর্ম —হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মের অন্তর্নিহিত সারসত্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছিলেন, এইসব ধর্মের মূলশাস্ত্র মূলভাষায় পাঠ করে। অসামান্য মনীষী রামমোহন এইসব ধর্মশাস্ত্র পাঠ করে এই মতে উপনীত হয়েছিলেন যে,—ঈশ্বর এক, পথ ভিন্ন মাত্র অর্থাৎ যত মত তত পথ—যে তত্ত্বটি কয়েক দশক পরে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব স্বীয় জীবনে উপলব্ধি করে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। সমস্ত ধর্মের মূলসূত্র যিনি উপলব্ধি করতে পারেন, তিনি হয়ে উঠেন সর্বধর্ম সমন্বয় মতের প্রবক্তা। রামমোহন ছিলেন এমনই এক প্রবক্তা। এই উপলব্ধিই তাঁকে প্রবুদ্ধ করেছিল Unitarian আন্দোলনের শরিক হতে। কোলকাতায় যেমন তিনি ব্রিটিশ খ্রীষ্টানদের হাতে হাত মিলিয়ে Unitarian church গঠনে অগ্রণী হয়েছিলেন, তেমনি ব্রিষ্টলে যাওয়ার পর সেখানকার Unitarian church সংগঠনের সহায়তা করেন ও ওই চার্চে অনেকগুলি বক্তৃতা করে তাঁর উদার ও যুক্তিনিষ্ঠ মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। এই ধরনের মনোভাব সম্পন্ন মানুষের পক্ষে নতুন কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মের স্রষ্টা হিসাবে কাজ করা সম্ভব কি? যে মন কাজ করেছিল Unitarian church সংগঠন করার পেছনে, ঠিক সেই মন সক্রিয় ছিল উনিষদের উপর হিন্দু ধর্মকে ভিত্তিজাত করতে—সম্পূর্ণ নতুন কোন ধর্মসম্প্রদায় সৃষ্টি করার ভাবনা তাঁর এই প্রয়াসের পেছনে ছিল বসে বিশ্বাস করা যায় না। অথচ রামমোহনের বেদান্তের এই নব্য-ভাষ্য

প্রয়াসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করার অবকাশে এক নব্য-সম্প্রদায়ের সভ্যরা হিন্দুসমাজ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে নিজেদের ব্রাহ্ম বলে ঘোষণা করলো। শিখেদের একাংশ গুরু গোবিন্দের মৃত্যুর পর ঠিক একই পথ বেছে নিয়েছিল। যদিও শিখেদের আদিগুরু নানকের কোন একটি বিশেষ স্বতন্ত্র ধর্মসৃষ্টির অভিপ্রায়ই ছিল না, 'একমেবং দ্বিতীয়ম্…' এই তত্ত্ব প্রচার ব্যতীত।

সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করে প্রগতিপরায়ণ করার জন্যই তিনি সনাতনী হিন্দুধর্মকে মার্জনা করতে চেয়েছিলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন, মুক্তমন না হতে পারলে দেশের যথার্থ সমৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। জনগণের এই মানসিক প্রস্তুতির উদ্দেশ্যেই হোল তাঁর ধর্মসংস্কারিক আন্দোলনের অন্তর্নিহিত কারণ। এখানে ইহ-লৌকিক বিবেচনাই কাজ করেছে এই সংস্কার প্রয়াসের পেছনে—পারলৌকিক কিন্তু কোন উদ্দেশ্য নয়। কারণ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পারলৌকিক হলে রামমোহন বাস্তব পৃথিবীর বিষয়বস্তুর উপর এত গুরুত্ব দিতেন না, সারা জীবন ধরে। পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম-সংস্কারকের ক্ষেত্রে কি এমনটি দেখা যায়? এমনকি নিরীশ্বরবাদী শূন্যবাদী গৌতম বুদ্ধের জীবনেও নয়। নয় মার্টিন লুথারের জীবনেও। এদিক থেকে রামমোহন একক ও বিশিষ্ট মানুষের মঙ্গল, জাগতিক কল্যাণ চিন্তা তাঁর মনকে অধিকার করে থাকতো সর্বক্ষণ। এইজন্যই তিনি যত না ধর্মসংস্কারক তার চেয়ে অনেক বেশী সমাজসংস্কারক ও রাজনীতিবিদ। স্বকীয় মুক্তি বা মানুষের জাগতিক বন্ধন-বাসনা ও কামনা থেকে মুক্তিই যদি তাঁকে ধর্ম-সংস্কারে উদ্বুদ্ধ করে রাখতো, তাহলে তিনি সতীদাহপ্রথা নিবা-রণের জন্য অথবা, ভূমি সংস্কারের জন্য অথবা, সংবাদপত্রের জন্য জীবনব্যাপী আন্দোলন করতেন না। পারলৌকিক চিন্তার সঙ্গে ইহলৌকিক বিবেচনা অন্য কোন ধর্মসংস্কারকের জীবনে এমন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়নি এবং তা যায়নি কারণ তিনি

ছিলেন একান্তভাবে ব্যক্তিমানুষের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনাকে অনুভব করেছিলেন বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে। যিনি যথার্থ মানবতাবাদী, তিনি কখনো তার দৃষ্টিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে রাখেন না। পৃথিবীকেন্দ্রিক তাঁর চিন্তা। রামমোহন এই পৃথিবীকে নিজের জীবনে স্বীকার করেছিলেন বলেই উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে তিনি প্রথম মানবতাবাদী বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে যে শিক্ষা, যে সংস্কৃতি জনমানসে গৃহীত হয়েছিল তা ছিল মূলতঃ বস্তুবাদী ও ইহলোককেন্দ্রিক। মিল ও বেন্থামের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক ধ্যানধারণা Utilitarianism ও ধর্মনিরপেক্ষ নীতিবাদ। (যা ইমানুয়েল কান্টের দর্শনে বিধৃত হয়েছে।) কেবল ইউরোপের মানুষকে প্রভাবিত করেনি, সেইসব চিন্তার ঢেউ ভারতবর্ষের উপকূলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। মহাকবি শেলীর মানবতাবাদী বিদ্রোহ—যা কর্তাভজা মানবিকতার বিরুদ্ধে ছিল একটা বিরাট চ্যালেঞ্জস্বরূপ, তারই ভারতীয় রূপ আমরা দেখলাম তৎকালীন নব্যপন্থী, যুক্তিবাদী ও অজ্ঞেয়বাদী ডিরোজিও ও তার ভাবশিষ্যদের মধ্যে। আর ডিরোজিওরই প্রায় সমকালীন ছিলেন রাজা রামমোহন—যিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে পরিচিত হয়েছিলেন এই বস্তুবাদী চিন্তার সঙ্গে। ফলে, তাঁর চিন্তায় যতনা ভাববাদী দর্শন স্থান পায়, তার থেকে অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করে তৎকালীন ইউরোপের বস্তুবাদী ও জড়বাদী ভাবনা। একথা সত্য যে, ভারতবর্ষের চিন্তাজগতের শ্রেষ্ঠতম প্রসূন বেদান্তদর্শন ছিল তাঁর ধর্মসংস্কারের প্রধান উৎস, কিন্তু তিনি বেদান্তদর্শনের ভাষ্য করতে গিয়ে শঙ্করাচার্যের মায়াবাদকে প্রাধান্য দেন নি বা, ব্যবহারিক জগতে এই মায়াবাদকে প্রয়োগ করতে যাননি। এদিক থেকে তাকে বিবেকানন্দের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। স্বামীজী

বেদান্ত-উপনিষদের একনিষ্ঠ ছাত্র হলেও এবং বেদান্তের বাণী পাশ্চাত্যের পথে ও প্রান্তরে ছড়িয়ে দিলেও, ভারতবর্ষের মানুষকে তিনি বস্তুবাদী চিন্তার দিকে আকর্ষণ করতে দ্বিধা করেন নি। কারণ তিনি বুঝেছিলেন, বস্তুজগৎকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিল বলেই ভারতবাসী একটা চূড়ান্ত জাড্যের বশীভূত হয়ে ত্রিশঙ্কুর অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল। সে পৃথিবীকে হারালো আর মুক্তির স্বর্গও হাতের নাগালের বাইরে রয়ে গেল। একটা তমসাচ্ছন্ন আবরণ আবৃত করলো তার সমস্ত জীবন, চিন্তা ও ঐতিহ্যকে।

রামমোহন মূলতঃ যুক্তিবাদী হওয়ায় বিবেকানন্দের পূর্বসূরী হিসাবে একই ধরণের চিন্তা করেছিলেন বিবেকানন্দের আবির্ভাবের অন্ততঃ অর্ধশতাব্দী পূর্বে। তাঁর এই বস্তুবাদী ও যুক্তি-প্রবণতা তাঁর সময়ে নিশ্চয়ই বিস্ময়কর ছিল, প্রায় ব্যতিক্রমই বলা চলে। কারণ সমস্ত দেশ যখন মধ্যযুগীয় আবহাওয়ার ও অন্ধকারে পরিবৃত, ঠিক সেই সময়ে এই ধরনের চিন্তা বৈপ্লবিকই বলতে হবে। এদিক থেকে তিনি মার্টিন লুথারের সমকক্ষ, যদিও লুথার ছিলেন মূলতঃ ধর্মসংস্কারক। বাংলা তথা ভারতবর্ষের একটি গণনীয় সংখ্যক লোক এখনও পর্যন্ত রামমোহনকে ধর্ম-সংস্কারক হিসাবে দেখবার ও দেখাবার চেষ্টা করছেন। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রামমোহন মূল্যায়নে রামমোহনকে সেই Myth-এর কবল থেকে মুক্ত করে তাঁকে তাঁর যথার্থ স্বরূপে পুনর্বাসন করা প্রয়োজন, নচেৎ সত্যের মুখ চিরকালই অর্ধসত্যের স্বর্ণ আবরণে ঢাকা পড়ে থাকবে—রামমোহন পরিচিত হয়ে থাকবেন আর পাঁচজন ঈশ্বরপ্রেমিক বাস্তববিমুখ বৈরাগী বাউলদের একজন হিসাবে। ভারতবর্ষ চিরকালই বৈরাগী বাউল ঈশ্বরপ্রেমিকের দেশ, এবং রামমোহনকে তাদের পর্যায়ে ফেলে বিচার করলে, তাঁর বৈশিষ্ট্য কোনদিনই ধরা পড়বে না।

কয়েকটি ব্রহ্ম-সংগীত (যার সংখ্যা ৩২-এর বেশী নয়) বাদ

দিলে রামমোহনের ভক্তিমার্গীয় প্রবণতা খুব বেশী রচনায় পাওয়া যায় না। তাঁর ঈশ্বর-ভাবনা ছিল মূলতঃ জ্ঞানমার্গীয়। ঈশ্বর-কেন্দ্রিক জ্ঞানচর্চার দ্বারা তিনি চেয়েছিলেন, ভারতবর্ষের হৃতগরিমা পুনরুদ্ধারের উপায় আবিষ্কার করতে—যাতে বিদেশীর কাছে জাতির সম্মানকে অটুট রাখা যায়। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি যে একটা বর্বর যুগের স্মারকমাত্র নয়, এই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভিত ছিল একটা পুরানো সুসমৃদ্ধ সভ্যতার ফলশ্রুতি—এই তথ্য তিনি পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন তাঁর ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে। খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে বা সংগ্রামে এই সত্য প্রমাণ করা ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। হিন্দুদের নিছক পৌত্তলিক বলে দেখিয়ে তাদের একটা খুব নীচু দরের প্রায় বর্বর জাতি হিসাবে প্রতিপন্ন করাই ছিল খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের তৎপরতার অন্যতম প্রধান অঙ্গ। তাদের বাংলা ভাষা ও চর্চার অধিকাংশ ক্ষেত্র ছিল এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এই মিশনারীদের সকলেই হেয়ার বা বেথুন ছিলেন না—গায়ের চর্ম যদিও সকলের শ্বেতকায়। অবশ্য একথা বলা প্রয়োজন যে, বেথুন ও হেয়ার এরা কেউ মিশনারী ছিলেন না এবং এঁদের শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসের কারণ ছিল নিতান্তই মানবিক, এবং এই জন্য তাঁরা ভারতীয়দের মনে আজও জীবন্ত। খ্রীষ্টান মিশনারীদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারকে প্রতিহত করাই ছিল সংগ্রামী রামমোহনের অন্যতম মূল লক্ষ্য। বাংলা গদ্য ইস্তাহার ও পুস্তিকা বার করে এই সব পাদ্রীদের সঙ্গে কেবল লড়াই করেন নি (এই প্রসঙ্গে তাঁর ব্রহ্মণ সেবধি, ব্রাহ্মণ ও মিশনারী সংবাদ শীর্ষক রচনা স্তবক দ্রষ্টব্য), খ্রীষ্টান ধর্মের অন্যতম Tenet ত্রিত্ববাদ (Trinitism-পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা) ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন করেছেন ও দেখিয়েছেন যে, এই ত্রিত্ববাদ এক ঈশ্বর ধারণার পরিপন্থী। 'ঈশ্বর এক'—এই মত প্রতিষ্ঠিত করতে রামমোহন কেবল হিন্দুদের পৌত্তলিকতাকে আক্রমণ করেন নি,

খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদকে সজোরে আঘাত করতে দ্বিধা করেন নি। পাদরি ও শিষ্য সংবাদ পুস্তিকায় কথোপকথনের ছলে রামমোহন এই ত্রিত্ববাদকে আক্রমণ করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন, এই তত্ত্ব ভ্রমাত্মক। এই সংগ্রামই প্রমাণ করে রামমোহনের চিত্তের ও মতের দৃঢ়তা। এই দৃঢ়চিত্ততার জন্যই তিনি রাজার জাতির ধর্মের মধ্যে নিহিত অসঙ্গতির সমালোচনা করতে এতটুকু ইতস্ততঃ করেন নি। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব না থাকলে এই সময়ে এই ধরনের স্বাধীন চিত্ততার পরিচয় দেওয়া সম্ভব হোত না। ত্রিত্ববাদকে তিনি কেবল সমালোচনাই করেন নি, ঈশ্বরের ঐক্যের ধারণাকে খ্রীষ্টীয় সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি Unitarianism-এর প্রচারে সহায়তা করেছিলেন সম-মতাবলম্বী ব্যক্তিদের হাতে হাত মিলিয়ে। ব্রিষ্টলে তিনি অনেক সময় ব্যয় করেছিলেন এই মত প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে। একথা আজও স্মরণ করে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্রিষ্টলের মানুষ।

যেমন হিন্দুধর্মের যথার্থ স্বরূপ তুলে ধরার জন্য রামমোহন সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করেছিলেন গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে, ইংরেজী ও অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাষায় পাঠ নিয়েছিলেন খ্রীষ্টান ধর্মের সারতত্ত্ব জানতে, তেমনি তিনি আরবী ও ফার্সী ভাষা শিখেছিলেন ইসলাম ধর্মে গোড়ার কথা সম্বন্ধে সম্যকভাবে অবহিত হতে। ইসলাম শাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞানের জন্য তিনি জবরদস্ত মৌলবী আখ্যায় আখ্যায়িত হন। বিভিন্ন ধর্মের প্রতি তাঁর এই দৃষ্টি-ভঙ্গীর জন্য—রামমোহন ও রামকৃষ্ণদেবের মানসিকতার একটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়; তবে দু'জনের পার্থক্য হোল এই যে, রামমোহন যেখানে তাঁর জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে বিভিন্ন ধর্মের উপর বাইরে থেকে উড়ে-পড়া আবর্জনা ও অসঙ্গতি দূর করতে চেয়েছিলেন, পরমহংস চেয়েছিলেন ভক্তিমার্গের সাহায্যে এক ঈশ্বরের ধারণা মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করতে—এবং এই উদ্দেশ্য

নিয়েই তিনি বিভিন্ন ধর্মের আচার পালন করেছিলেন আর প্রচার করেছিলেন 'যত মত তত পথ'। সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়বাদ ছিল দুই বিরাট পুরুষের মূল লক্ষ্য—একজন সেই লক্ষ্যে পৌঁছালেন জ্ঞান মার্গে আর একজন সেই তত্ত্বকে উপলব্ধি করলেন ভক্তিমার্গের সহায়তায়। রামমোহনের পক্ষে জ্ঞানমার্গকে গ্রহণ করার মধ্যে রয়েছে তাঁর স্বভাবজাত যুক্তিপ্রবণতার পরিণতি। এই যুক্তি-প্রবণতাই তাঁকে সহায়তা করেছে তাঁর সম্পাদিত প্রতিটি সংস্কার কার্যে—সে সংস্কার ধর্মনৈতিক হোক বা, সমাজনৈতিক হোক অথবা, রাজনৈতিক হোক। রামমোহন জ্ঞানমার্গী না হলে দেশব্যাপী কুসংস্কারের জঞ্জালকে ঠেলে সরাতে সক্ষম হোতেন না, দেশের মানুষকে ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে সচেতন করতে। তাঁর সমস্ত কার্যের মূলে ছিল মানুষের কল্যাণ কামনা। মানবতাবাদ তাঁর মানুষের প্রতি এই শুভ কামনার মূল উৎস। নিছক জ্ঞানচর্চা নয়, জ্ঞানের সঙ্গে কল্যাণ ও শুভবুদ্ধি রামমোহনের মানসিক কাঠামোর পাশাপাশি বিরাজ করেছে। তার এইজন্যই মানুষ হিসাবে তিনি এতখানি সার্থক।

আমরা যদি রামমোহনের রাজনৈতিক কার্যকলাপের দিকে চোখ ফেরাই, তাহলে তাঁর বাস্তববাদসম্মত মানবকল্যাণকামী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাবো আরো পরিচ্ছন্নভাবে। রামমোহন আজকের দিনের জাতীয়তাবাদের আলোকে নিশ্চয়ই কট্টর দেশ-প্রেমী বলে পরিগণিত হবেন না। অথচ তিনি ছিলেন যথার্থ দেশপ্রেমিক নাগরিক। ব্রিটিশ ভারতবর্ষ থেকে চলে যাক, দেশীয় লোকেরা স্বাধীনভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করুক—এ কথা তিনি কোনখানে বলেননি ঠিকই, কিন্তু তাঁর অর্থ এই নয় যে, তিনি চাইতেন ইংরেজ দেশকে শোষণ করুক, অত্যাচারে জর্জরিত করুক ভারতবাসীকে, কেড়ে নিক তাদের মৌলিক অধিকার। রামমোহন মনে করতেন যে, মোগল সাম্রাজ্যের শেষ দিকে দেশব্যাপী যে

অরাজকতা দেখা দিয়েছিল, নেমে এসেছিল যে মধ্যযুগীয় অন্ধকার তার হাত থেকে ব্রিটিশরাজ ভারতবাসীকে অনেকটা মুক্ত করেছে, নিয়ে এসেছে আঁধারনাশী আলোক। তাই ব্রিটিশ শাসনের প্রাক্‌কালে মনে যখন আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে, তখন ব্রিটিশের ভারত থেকে অপসারণ নতুন করে ফিরিয়ে আনবে সেই মধ্যযুগীয় তমিস্রা। রামমোহন বিশ্বাস করতেন, ব্রিটিশের আওতায় থেকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণ করে দেশকে সমৃদ্ধ করে তোলা যাবে—তাই তারা থাকুক। তবে শোষণকারী হিসাবে নয়, তারা থাকুক ভারতবাসীদেরই একজন হয়ে এবং তাহলেই তাদের শোষণ ও লুণ্ঠন স্পৃহার অবসান ঘটবে। ভারতবর্ষে এমনটি বহুবার ঘটেছে। বিদেশীরা এসেছে বারে বারে এ-দেশ লুণ্ঠন ও শোষণ করতে। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত মিশে গেছে ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মহাসাগরে, তারা শেষ পর্যন্ত স্বদেশকে নিজের দেশ বলে মনে করেছে। রামমোহন এই ভাবেই চিন্তা করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে বাকসংযম বা সক্রিয় সমর্থনের অভাবও এই মনোভাব সঞ্জাত ছিল বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। রামমোহনের প্রতিবাদ ছিল ইংরেজের শোষণের বিরুদ্ধে—ইংরেজের বিরুদ্ধে নয়। পরবর্তী শতাব্দীতে গান্ধিজীর অহিংসা নীতি এই নীতিরই আর একটি সংস্করণ, যা একটি মৌলিক দর্শনের উপর ভিত্তিজাত হয়েছিল। রামমোহন যখনই দেখেছেন ইংরেজের অবিচার ও বৈষম্যমূলক আচরণ, তখনই তিনি প্রতিবাদ করেছেন—শালীনতার সঙ্গে রুখে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর সময়ে আদালতে দেশী ও বিদেশী খ্রীষ্টানদের বিচারের সময় একমাত্র খ্রীষ্টানরাই অংশগ্রহণ করতে পারতো—হিন্দু বা মুসলমান দেশীয়দের এখানে নির্বাচিত করা হতনা ওই উদ্দেশ্যে। এই অসম্মানজনক বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রামমোহন সংগ্রাম সুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ তার

ব্রিটেনে প্রবাসকালে এই অপমানজনক আইনের অবসান ঘটে—নতুন আইন "East India justices of the peace and jury bill" পাস করার ফলে। ব্রিটিশরাজ কর্তৃক সংবাদপত্রের উপর বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে রামমোহনের বিরোধিতার অন্ত ছিল না। প্রতিবাদের নিদর্শন হিসাবে তিনি তাঁর ফার্সী সংবাদপত্র মিরাট-উল আকবর, বন্ধ করে দেন। আর সাময়িকভাবে বন্ধ রাখেন তাঁর বাংলা সংবাদপত্র সংবাদ কৌমুদী—এই পত্রিকা ছিল বাংলা ভাষায় প্রকাশিত তৃতীয় সংবাদপত্র। এই দুই সংবাদপত্র ছিল রামমোহনের সংগ্রামের প্রধান দুই হাতিয়ার। ব্রিটিশরাজ সংবাদপত্রের প্রভাবকে চিরকালই ভয় করে এসেছে। তাই সংবাদপত্রাদির উপর প্রারম্ভ থেকে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করতে এতটুকু দ্বিধা করেনি, এবং এই বিধিনিষেধের চূড়ান্ত পরিচয় আমরা পাই 'Vernacular press act' এর মধ্যে, যার ফলে বাংলা অমৃতবাজার পত্রিকাকে উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে ইংরজী পত্রিকায় রাতারাতি রূপান্তরিত হতে হয়—এই আইনের করালগ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচাতে। রামমোহন মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতিটি প্রকাশকেই শ্রদ্ধা করতেন। তাই বাক্ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার বাহন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য একদিকে যেমন তিনি নিরলস সংগ্রাম করে গেছেন, অন্যদিকে মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সর্বপ্রকার প্রয়াসকে স্বাগত জানিয়েছেন—দেশ ও কালের গণ্ডী ছাড়িয়ে। ব্যক্তিমানুষ হিসাবে যেকোন জাতির মুক্তিকামী মানুষের প্রতি ছিল তাঁর পরম সহানুভূতি। তাই নেপল্‌স যখন আক্রিকার আক্রমণে স্বাধীনতা হারায়, রামমোহন সমবেদনা পত্র লিখলেন ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদক বার্কিহামের কাছে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে। আবার এই রাম-মোহনই উল্লসিত হয়ে উঠলেন যখন (১৮২২ খৃষ্টাব্দে) সংবাদ পেলেন যে, স্পেনের শাসন থেকে মুক্তি পেয়েছে দক্ষিণ আমে-

রিকার উপনিবেশসমূহ। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবের খবর পেয়ে, তিনি এতদূর উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন যে, কয়েকদিন ধরে কেবল এই বিপ্লবের কথাই চিন্তা করেছিলেন এবং উত্তেজনা মুহূর্তে ফরাসী জাতির পতাকাকে সম্মান জানাতে গিয়ে জখম হন। মানবস্বাধীনতার উপর কতখানি শ্রদ্ধা থাকলে, সংগ্রামী মানুষের প্রতি কতখানি মমত্ববোধ থাকলে, মানুষ এমনভাবে দেশ ও কালের গণ্ডী এমনকি নিজের নিরাপত্তাও ভুলতে পারে। রাম-মোহন ছিলেন এমনই একজন মানব-প্রেমিক, মানবদরদী। অথচ এমন বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধসম্পন্ন মানুষকে ফরাসী সরকারী 'ভিসা' দিলেন না, যখন তিনি স্বাধীনতার পীঠস্থান ফ্রান্সে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ফরাসী সরকারের ভিসাদানে অস্বীকৃতির উপর রামমোহনের মন্তব্য সত্যই ঐতিহাসিক। তিনি বলেছিলেন, তিনি মানুষ হয়ে যখন জন্মেছেন, তখন মানুষ হিসাবে যেকোন দেশে তাঁর যাওয়ার অধিকার আছে। জাতি ও ভূগোলের সীমানা কেন তাঁর পথে প্রতিবন্ধক হবে? কেন খর্ব করা হবে তাঁর যাতা-য়াতের স্বাধীনতা? এইভাবে উক্ত করেছিলেন রামমোহন 'এক পৃথিবী, এক জাতি' স্বপ্নের বীজ—বিশ্বনাগরিকতা দাবি করে। অথচ দেশপ্রেমে তাঁর এতটুকু ঘাটতি ছিল না। এদিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রামমোহনের যথার্থ ও যোগ্যতম উত্তরসূরী, যিনি তৈয়ারি করেছিলেন দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয়ী সেতু। ভারতের মাটিতে যে মানবতাবাদ রামমোহনে প্রথম স্ফুরিত হোল, রবীন্দ্রনাথে তা নিল বিশিষ্ট রূপ —বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম হোল বিশ্বভারতী।

এই মানবতাবোধ ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা রামমোহনকে প্রবুদ্ধ করেছিল ভারতে ব্রিটিশ ব্যবসায়ী ও নীলকর জমিদারদের স্থায়ীভাবে বসবাসের পক্ষে আন্দোলন চালাতে। তিনি বুঝে-ছিলেন যে, ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর লোকেরা যদি ভারতকে তাদের

নিজেদের দেশ বলে মনে করে, এদেশে বসবাস করে পাকাপাকি-ভাবে, তাহলে একদিকে যেমন দেশীয় দুঃস্থ রায়তদের অবস্থার উন্নতি ঘটবে, অন্যদিকে ব্রিটিশদের ভারত-শোষণ করার প্রবৃত্তি হ্রাস পাবে,—লুণ্ঠন করার কারণ অপসৃত হবে। এই সময় দেশীয়রা ইংরেজ শাসনের অবসানের চিন্তা করতে কেউ শুরু করেনি (পূর্বে একথা উল্লিখিত হয়েছে), বরঞ্চ শিক্ষিত-সমাজ দেশের উন্নতি কামনায় ইংরেজের সহযোগিতা কামনীয় মনে করতো। কাজেই দেখা যায়, রামমোহনের রাজনৈতিক চিন্তা তৎকালীন আবহাওয়ানুগ ছিল এবং তাঁর মত যুক্তিবাদী মানুষের পক্ষে ছিল বাস্তবানুগ। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে এক সময়ে রামমোহন ব্রিটিশদের ভারতে পাকাপাকিভাবে বসবাসের স্বপক্ষে একটি যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রেখেছিলেন এবং অত্যন্ত সজোরে বলেছিলেন যে, দেশীয় রায়তদের অবস্থার অনেকখানি উন্নতি ঘটেছে নীলকর সাহেবদের সঙ্গে কাজ করে। কেবল সভা সমিতি করে নয়, তাঁর সম্পাদিত সংবাদ কৌমুদীতেও তিনি এ সম্বন্ধে তাঁর মতামত অতি নির্ভীকতার সঙ্গে প্রমাণ করেছিলেন। তাঁর আন্দোলন এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ সার্থক না হলেও এই আন্দোলনের ফলেই ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের জমি দখলের উপর বিধিনিষেধ অনেকটা শিথিল হয়েছিল। আজকের দিনে রামমোহনের এই প্রয়াস অনেকটা অস্বাভাবিক ঠেকলেও, তখন এই ব্যবস্থাই ছিল বাস্তবসম্মত।

রামমোহনের আন্তর্জাতিক মানবিকতার সঙ্গে তাঁর ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীকে ভারতীয় করণের প্রয়াস ছিল সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ভারতীয় ঐতিহ্যসম্মত। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ আগ্রাসী হয়ে শোষণে উদ্বুদ্ধ করে আগ্রাসী জাতিকে, আর শোষিত জাতি এই আগ্রাসী জাতির প্রতি হয় প্রতিশোধ-উন্মুখ, ফলে, সংঘাত দেখা দেয় মানবিক ঐক্যবোধ হয় বিপর্যস্ত। ইংরেজেরা সত্যই যদি রামমোহনের এই প্রয়াসকে স্বাগত জানাতে পারতো, তাহলে

ভারতবর্ষের ইতিহাস হোত অন্য প্রকারের। চরম তিক্ততার মধ্যে ইংরেজকে ভারত ছেড়ে যেতে হোত না। অতীত ভারতে শক, হুন, ও অন্যান্য অনেক বিদেশী যেমন আত্মীকরণের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছিল, তেমনি সমৃদ্ধ করতে পারতো ইংরেজরা একভাবে, ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির দ্বারা। ভারতীয় সমাজের উপরতলায় একটি কৃত্রিম শ্রেণী সৃষ্টি করে নিঃশব্দে তাকে বিদায় নিতে হোত না ভারতের মাটি থেকে। আরোপ নয়, আত্মীকরণ হোল সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রগতির সহায়ক। বিভিন্ন সভ্যতার ও সংস্কৃতির যথার্থ সমন্বয়ই একদিন ইতিহাসের চাকাকে নতুনতর খাতে চালিয়ে নেবে—'এক পৃথিবীর' সেই স্বপ্ন সার্থক হবে, যে-স্বপ্ন প্রায় দেড়শত বৎসর আগে দেখেছিলেন অনগ্রসর ভারতের এক সন্তান, রাজা রামমোহন রায়। এই স্বপ্নের মধ্যে ঘটেছিল দেশপ্রেমিক রামমোহনের জাতীয়তাবাদের আন্তর্জাতিকতা ও মানবতাবাদে উত্তরণ, এবং এই উত্তরণ ছিল ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারী। প্রাচীনকাল থেকে ভারতের ভাবনা ও চিন্তা ভূগোলের সংকীর্ণ গণ্ডীতে কোন দিনই আবদ্ধ থাকেনি। হয়ত এর কারণ তাদের চিন্তার অধ্যাত্মকেন্দ্রিকতা। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আচার ও সংস্কারের বেড়াজালে আটকা পড়েও ভারত ব্যক্তিমানুষের সত্তাকে কোনদিন জাতীয় সংকীর্ণতার কষ্টিপাথরে যাচাই করেনি —এবং এই জন্যই তার পক্ষে উদার বাহু বিস্তার করা সম্ভব হয়েছিল। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার এ এক বিরাট অবদান। এই ধরনের অবদান ইউরোপের মাটিতে নবজাগরণের পূর্বে আমরা লক্ষ্য করিনি। ভারতের আধ্যাত্মিকতা একদিকে তাকে পার্থিবতা-বিমুখ করলেও অন্যদিকে তার মানসিক ঔদার্য ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারের সহায়ক ছিল ঠিকই। কিন্তু ইউরোপে নবজাগরণের পরে মানবতাবাদের প্রসার ও ব্যক্তিমানুষের স্বীকৃতি ঘটলেও

পার্থিবতার জানালা দিয়ে জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণতা এলো 'একজাতি এক রাষ্ট্র' ধ্বনিকে বাহন করে। নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ প্রসূন মানবতাবাদের উপর সংকীর্ণ দেশপ্রেম বসলো জগদ্দল পাথর হয়ে—কূটনীতিবিদদের চক্রান্তে মানবিকতা বোধ গেল শুকিয়ে। জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে যে যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হয়েছিল ইউরোপের মাটিতে আজও তার জের চলেছে সমস্ত জগৎ জুড়ে। শত শত মেটারনিক আর মেকিয়াভেলিতে পৃথিবী ভরে গেছে। পৃথিবী বিভক্ত হয়েছে বিভিন্ন শিবিরে। সাম্রাজ্যবাদের আজ বিভিন্ন রঙ,—জাতীয়তাবাদের আজ নানা বৈচিত্র্য—মানবতাবাদের পীঠস্থান সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের দপ্তরখানায় আজ রাজনৈতিক ভণ্ডামির প্রতিযোগিতা চলেছে নির্লজ্জভাবে। তাই মানবতাবাদ ও আন্তর্জাতিক মানসিকতা নিতান্তই কথার কথা। প্রায় দেড়শত বৎসর আগে রামমোহন যখন আন্তর্জাতিকতাবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ফরাসী দেশ দর্শন করতে চেয়েছিলেন বিশ্বের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে, তখন যে-কারণ তাঁর যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাড়িয়েছিল, সে বাধা আজও বর্তমান, এবং তা আরো বেশী অসহনীয় হয়ে। এই বাধা হোল জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ গণ্ডীতে মানুষেরে বেঁধে রাখা—তার পায়ে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক গণ্ডীর শৃঙ্খল পরিয়ে।

রামমোহনের জীবন ও বাণী আমরা যদি ঠিক মত অনুধাবন করার চেষ্টা করি, প্রয়াস পাই তার যথার্থ বিশ্লেষণ করতে, তা হলে দেখবো তাঁর সমস্ত জীবন নিঃশেষিত হয়েছিল ব্যক্তিমানুষের মুক্তি কামনায়, অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য। দেশ ও জাতি তিনি বিচার করেন নি মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রামের সময়। আর এই জন্য তিনি শুধু ভারতবাসীই ছিলেন না—তিনি ছিলেন বিশ্বপথিক। মধ্যযুগীয় অন্ধকারসমাচ্ছন্ন ভারতবর্ষে রামমোহনের আবির্ভাব সত্যই তাই একটি বিস্ময়কর

ঘটনা। তিনি নিজে বিশ্বমানবিকতাবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিলেন বলে, সবসময় চাইতেন মানুষের মধ্যে বিশ্বমানবিক চেতনা জাগ্রত করতে, এবং যেখানে এই বোধের অভাব তিনি দেখেছেন, সেখানেই তিনি বেদনা অনুভব করেছেন। ফ্রান্স ভ্রমণে তাঁর জীবন এমনি একটা বেদনাদায়ক ঘটনা ছিল। প্রতিপদে বাধাপ্রাপ্ত আজকের আমরা রামমোহনের এই বেদনার গভীরতা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারবো না, কারণ বাধা পেতে পেতে বাধাটাই আজ আমাদের কাছে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে, ভৌগোলিক দিক থেকে পৃথিবী অনেক ছোট হয়ে গেলেও রাজনৈতিক কারণ এক দেশের মানুষকে অন্যদেশের মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছে। তাই বুদ্ধি দিয়ে বিশ্বমানবিকতা-বোধের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও বাস্তবক্ষেত্রে আমরা হয়ে আছি কূপমণ্ডুক—এক ধরনের সংকীর্ণ রাজনৈতিক জীব, যে জীব ভৌগোলিক গণ্ডীকেই কার্যতঃ একমাত্র বাস্তব সত্য বলে স্বীকার করে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বকে ব্যাহত করছে প্রতিপদে। তাই, আজকের দিনে রামমোহনের মত মানুষের আবির্ভাব ঘটলে তাকে হয়ত 'রাষ্ট্রহীন নাগরিক' (Stateless citizen) বলে ঘোষণা করা হোত এবং এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক বলে মনে হবে না এই কারণে যে, স্বদেশে রামমোহনের উদার নৈতিকতা ও মানবতাবাদ—অনেকের কাছেই যথাযথ মর্যাদা পায়নি—তাঁকে অনেক সময়ই অপদস্থ হতে হয়েছিল, প্রাণের আশঙ্কা নিয়ে ঘোরা-ফেরা করতে হোত এক এক সময়ে। কিন্তু সমস্ত অবমাননা ও লাঞ্ছনা তাঁকে তাঁর নীতি থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। মার্টিন লুথারের চরিত্রের সঙ্গে এদিক থেকে তাঁর একটি বিরাট সাদৃশ্য দেখা যায়,—সংস্কারক হিসাবে উভয়ের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও।

ইতিহাসের গতি হঠাৎ বাঁক নেয় না—ইতিহাস রচিত হয় না

একদিনে। যদিও অসীম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ বা বিশেষ একটি বৈপ্লবিক প্রকৃতির ঘটনা এই ইতিহাস রচনায় সহায়তা করে, ইতিহাসের স্রোতে তীব্রতা আনে। একথা স্মরণ রাখলে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলায় বিদ্যাসাগরের মতন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হৃদয়বান মানুষের অথবা মাইকেলের মত মহাকবি পর্যায়ের কবির আবির্ভাবের উৎসের সন্ধান পাওয়া যাবে অতি সহজেই। এ উৎস হলেন রামমোহন। পরিবর্তনের কার্যকারণ অন্তর্নিহিত ছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগের বিভিন্ন শিক্ষানৈতিক, রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক ঘটনার মধ্যে। কিন্তু ঘটনার স্রোত যথার্থ গতিবেগ পেতনা, যদি না রামমোহনের মত মানবতাবোধসম্পন্ন মনীষীর আবির্ভাব ঘটতো। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ড গতিবেগই তৎকালীন বাঙলার ইতিহাস তৈয়ারিতে সবিশেষ সহায়তা করেছিল,—এবং যার ফলে আমরা পেয়েছিলাম ঈশ্বরচন্দ্র ও মাইকেলের মত মানুষ এবং রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্বপ্রেমিক কবিকে। যে যুক্তিপ্রবণতা ও মানবতার বীজ রামমোহন বপন করলেন, ঈশ্বরচন্দ্র এসে তা পত্রপুষ্প-শোভিত বনস্পতির আকার ধারণ করলো এবং রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সে বনস্পতির শ্যামল ছায়া হোল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। ভারতবর্ষের মানবতাবাদ স্বীকৃত হোল বিশ্বজগতের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। অথচ আত্মবিস্মৃত আমাদের এই স্বীকৃতির মূলে যে মানুষটির মহান ও প্রধান অবদান রয়ে গেছে, আমরা সেই রাজা রামমোহনকে ভুলে বসে আছি। তাঁর যথাযথ মূল্যায়ণেই এই ভুলের যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত হবে।

চিরজিজ্ঞাসু ডিরোজিও

মধ্যযুগীয় তমসায় আচ্ছন্ন ভারতবর্ষে বাঙলার নবজাগরণের প্রধান ঋত্বিক রাজা রামমোহন রায়ের প্রখর যুক্তিবাদের খড়্গাঘাতে কুসংস্কার ও অজ্ঞতার মেঘ যখন সবে কাটতে শুরু করেছে সেই সময় আবির্ভূত হলেন বাঙলার আকাশে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অবাঙ্গালী পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, তৎকালীন ইয়ং বেঙ্গল বা বাঙালী তুর্কী তরুণ সমাজের অবিসংবাদী নেতা। বাঙলার নবজাগরণের পটভূমিকায় অবাঙ্গালী বা অভারতীয় মানব প্রেমিক মনীষীদের অবদান অল্প ছিল না। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির উইলিয়াম জোনস, শিক্ষাব্রতী আলেকজান্ডার ডাফ, মহামতি ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন, মানবদরদী শিক্ষা প্রসারক ডেভিড হেয়ার ও নির্ভীক ও তেজস্বী পাদ্রী লঙ্ এবং আরো অনেক ইউরোপীয় মহাপ্রাণ মানুষ ভৌগলিক গণ্ডীর সংকীর্ণতা ডিঙিয়ে ভারতবর্ষকে দিয়েছিলেন নিজেদের মাতৃভূমির সম্মান। পরাধীন ভারতবর্ষের দলিত ও শোষিত মানুষের দুঃখে তাদের মনে জেগেছিল গভীর বেদনা, ভারতবর্ষের অজ্ঞানতা দূর করার জন্য সর্বস্ব পণ করতে তাঁদের কোনো দ্বিধা ছিল না। ডিরোজিও এঁদের মতই ছিলেন অ-ভারতীয় যদিও তাঁর পূর্বের কয়েক পুরুষ ভারতবর্ষে বসবাস করেছিলেন। তবুও উল্লিখিত অন্যান্য ইউরোপীয় ভারতপ্রেমিকদের সঙ্গে ডিরোজিওর মানসিক ভূমির ছিল একটা বিরাট পার্থক্য। ওই সব ভারতপ্রেমিক (একমাত্র ডেভিড হেয়ার ব্যতীত) ছিলেন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রসূন—পাশ্চাত্তের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি ও উন্নততর জীবন চর্যায় বলীয়ান হয়ে অনগ্রসর ভারতবর্ষকে তাঁদের দেবার ছিল অনেক কিছু, এবং

তাঁরা দিতেও পেরেছিলেন অনেকখানি। কিন্তু ডিরোজিও? ভারতে বসবাসকারী পুর্তুগীজ সমাজের না ছিল সংস্কৃতি সম্পন্ন কোনো ঐতিহ্য—না ছিল প্রগতিবাদী মন। ডিরোজিওর পূর্ব পুরুষেরা অনেকে ভারতবর্ষে ব্যবসা করতে এসে সহজে ধনসম্পদ আহরণের লোভে লুঠেরা ও বোম্বেটের পেশা বেছে নিয়েছিল। পাশব শক্তির প্রদর্শনী ব্যতীত তাদের দেবার মতো আর কিছুই ছিল না। এ হেন অনগ্রসর ও ঐতিহ্যহীন সমাজে ডিরোজিওর আবির্ভাব। সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ চিন্তা করলে তাঁর সমাজে তাঁর আবির্ভাব একটা রহস্যময় ব্যতিক্রম বলা চলে নিঃসন্দেহে—চলতি ভাষায় তিনি আমাদের কাছে তাই প্রকৃতির খেয়াল (Nature's freak) বলে প্রতিভাত। ব্যক্তি মানুষ সাধারণভাবে সামাজিক পরিবেশের প্রসূন ঠিকই—পরিবেশ-চরিত্র ব্যক্তি চরিত্র গড়ে তোলে। কিন্তু ইতিহাস সৃষ্টিকারী বেগবান অসাধারণ ব্যক্তিত্ব (dynamic personality) আবার চলতি পরিবেশ উত্তীর্ণ হয়ে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করে—নতুন সমাজের সৌধ গঠন করে। এইসব ব্যক্তিত্ব বিশেষ বিশেষ পরিবেশে জন্মলাভ করলেও সম্পূর্ণভাবে পরিবেশ প্রভাবিত বা পরিবেশ নির্ভর থাকে না—এও এক বিস্ময়কর ঘটনা ও ঐতিহাসিক সত্য। তাই এইসব ব্যক্তিত্বের যথার্থ মূল্যায়ণ করতে হলে কেবলমাত্র পরিবেশের প্রভাবের কথা মনে রাখলেই চলবে না অন্যান্য বৈশিষ্ট্যকেও হিসাবের মধ্যে রাখতে হবে এবং ডিরোজিওর মূল্যায়নে একথা সর্বাগ্রে প্রযোজ্য।

কারণ ছাড়া কোনো ফলই প্রসূত হয় না। ডিরোজিওর বিপ্লবসাধন কোন কারণ সম্ভূত? কী সে উৎস? তাঁর সমাজ ও পরিবেশের মধ্যে সে কারণ, সে উৎস যদি নিহিত না থেকে থাকে তা হলে তা নিহিত কোথায়? তাই এই উৎস সন্ধানে আমাদের চলে যেতে হবে—তাঁর শিক্ষা জীবনে, তাঁর বিদ্যালয়ের

বছরগুলোতে, যেখানে উপ্ত হয়েছিল তাঁর বিপ্লবী চরিত্রের বীজ, যে বীজ একটি মাত্র ডিরোজিও সৃষ্টি করেনি, সৃষ্টি করেছিল 'ইয়ং বেঙ্গল' সমাজ সৃষ্টির অভিনব আবহাওয়া। স্কচ শিক্ষাব্রতী ডেভিড ড্রামণ্ডের শিক্ষানিকেতন 'ধর্মতলা একাডেমি' হয়ে উঠেছিল বিপ্লব সৃষ্টির কারখানা। ড্রামণ্ডের এই শিক্ষানিকেতনের সঙ্গে অনেকটা তুলনা করা চলে প্রাচীন গ্রীসের প্লেটোর একাডেমির। স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন মনন, স্বাধীন জীবনচর্যা, অনুসন্ধিৎসা ও মানব প্রেম—ইহাই ড্রামণ্ডের শিক্ষার মূল কথা। ড্রামণ্ড নিছক বিভিন্ন পাঠ্যাবস্থায় বা তথ্যের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটিয়ে তাদের প্রতি কর্তব্য শেষ করেন নি। পূর্ণ ব্যক্তি চরিত্র গঠন করাই ছিল তাঁর শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, ছাত্রদের মধ্যে একটি চিরজিজ্ঞাসু মন, অনুসন্ধিৎসা ও পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর একান্ত বাসনা। সব কিছু যাচাই করে গ্রহণ বা বর্জনের শিক্ষা ড্রামণ্ডের প্রধান অবদান এবং এই অবদানে ঐশ্বর্যশালী হয়েছিলেন ভিভিয়ান ডিরোজিও। প্রতিটি Hypothesis-কে যাচাই করতে গিয়েই ডিরোজিওর মন অতি লৌকিকতা, ঈশ্বর ও পরমার্থ থেকে পার্থিব মানুষের পৃথিবীতে সরে এসেছিল। এইখানেই রয়েছে ডিরোজিওর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর আসল উৎস। মধ্যযুগীয় ইউরোপের নবজাগ্রত বুদ্ধিজীবীদের অনুসন্ধিৎসা, সত্য যাচাইয়ের তৃষ্ণা থেকেই জন্ম নিয়েছিল মানবচিন্তা, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মানব কল্যাণ বোধ। ড্রামণ্ড তৎকালীন চলতি মূল্যবোধ ও সংস্কারের মূলে আঘাত করে এই কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, চলে আসছে বলেই কোনো বস্তু বা তত্ত্ব সত্য হতে পারে না। যুক্তির দ্বারা চলতি মূল্যবোধগুলিকে যাচাই করে নিতে হবে—আলোচনা ও বিতর্কের আলোয় মনের বদ্ধ জানালাগুলো খুলে দিতে হবে। প্রাচীন গ্রীসের মহাজ্ঞানী সক্রেটিস খোলা জায়গায়, বিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে তৎ-

কালীন যুবশক্তিকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন—চেয়েছিলেন তাদের সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে। কিন্তু স্থিতস্বার্থ রক্ষণশীল যুবশক্তির মধ্যে এই মানসবিপ্লব সৃষ্টির প্রয়াস সহ্য করতে পারলো না। সক্রেটিসের বিরুদ্ধে রাজশক্তি তরুণদের বিপথগামী করার অভিযোগ আনলো। সক্রেটিসকে হেমলক পান করে শেষ বিদায় নিতে হলো জ্ঞান চর্চার স্বাধীন চিন্তার চরম মূল্য হিসাবে। ডিরোজিওর সংক্ষিপ্ত তরুণ জীবনও সক্রেটিসের মতই বিষাদময়, যদিও তাঁকে হেমলক পান করতে হয়নি।

ডিরোজিও চরিত্রের বৈপ্লবিক সত্তার অঙ্কুরোদগমে একদিকে তাঁর শিক্ষক ড্রামণ্ডের যুক্তিবাদী, ব্যক্তিস্বাধীনতাকেন্দ্রিক ও মানববাদী শিক্ষা সহায়তা করেছিল, অন্যদিকে তৎকালীন সমাজের কুসংস্কার রক্ষণশীলতা ও নঞ্যর্থক (Negative) দিক তাঁকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল চলতি মূল্যবোধগুলির বিরুদ্ধে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে সামন্ততন্ত্রের কুফল ও নঞ্যর্থক চরিত্র বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছিল সেই সময়কার বাঙালী সমাজের সামন্ততান্ত্রিক জীবনযাত্রার মধ্যে। পূর্বপুরুষদের উদ্বৃত্ত অর্থসম্পদ অলস, বিলাসী ও ব্যয়বহুল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত করে তুলেছিল উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সন্তান—সন্ততিদের। মানসিক দিক থেকে ক্ষয়িষ্ণু এই সমাজ যে অপসংস্কৃতি সৃষ্টি করলো তাই-ই পরবর্তীকালে অনেক আলোচিত 'বাবু কালচারে' পরিণত হোল, যার অতি নিখুঁত ও জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত দেখা যায় 'হুতোম পেঁচার নক্‌সা' শীর্ষক রম্যপুস্তকে বা 'আলালের ঘরের দুলালে'। এই বাবু কালচার অবক্ষয়ী সামন্ততান্ত্রিক সমাজের Superstructure বা বহিরঙ্গ—যা ছিল কৃত্রিম ও অন্তঃসারশূন্য, যার শেকড় নাগর কোলকাতার ভাঙা দালানের বহির্বাটির সীমানায় অবরুদ্ধ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের পূর্বেই জীবনীশক্তি হারিয়ে স্বাভাবিকভাবেই শুকিয়ে গেল। কৃত্রিম জীবন পদ্ধতির

অন্তিমদশা এই করেই আসে, কারণ এর আয়ুষ্কাল নিতান্তই সীমিত। 'বাবু কালচারে' দীক্ষিত মানুষগুলির না ছিল যথার্থ ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিতি, না ছিল তাদের পাশ্চত্ত্য শিক্ষার আলোয় আলোকিত সংস্কারমুক্ত স্বাধীন মন, যে মন অন্যের পদের সঙ্গে পদ মিলিয়ে চলার ক্ষমতা রাখে। এইসব পরগাছা শ্রেণীর মানুষগুলি একদিকে দুর্গাপূজা ও পালাপার্বণে সহস্র অর্থ অপব্যয় করে ব্যয়বাহুল্যের অসুস্থ প্রতিযোগিতা দেখিয়ে হিন্দুয়ানির ধ্বজা তুলে ধরতো, অন্যদিকে ইংরাজীখানার সঙ্গে মদের ফোয়ারা ছুটিয়ে ইংরাজশাসকের পদলেহন করে যথাক্রমে দেশী ও বিদেশী সমাজে প্রতিপত্তি সৃষ্টির মাধ্যমে কাঙালিপণায় মেতে উঠতো। ইংরাজ শাসনমুক্ত স্বাধীন ভারতের একশ্রেণীর উগ্র ইংরাজীয়ানায় অভ্যস্ত হীনমন্য ভারতবাসীর যথার্থ ও আদর্শ পূর্বসূরী ছিল এই 'বাবু কালচার' সম্পন্ন মানুষেরা। উল্লিখিত 'হুতোম পেঁচার' চিত্রিত বাবুরা ডিরোজিওর অনেক পরের মানুষ হলেও, ডিরোজিওর সময় থেকেই এইসব বাবুদের পূর্বপুরুষ সমাজ-জীবনে অবক্ষয়ের সুচনা করেছিল, তাদের বিকৃত জীবনযাত্রার মাধ্যমে। এই অবক্ষয় ডিরোজিওকে চঞ্চল করে তুলেছিল, আন্দোলন শুরু হয়েছিল এই বিকৃত জীবনযাত্রার বিরুদ্ধেই। অথচ, নিয়তির এমনই পরিহাস যে, ডিরোজিওকে যখন হিন্দু কলেজের শিক্ষকতা থেকে সরাবার আদেশ হোল, তখন তাঁর বিরুদ্ধে অন্যতম পরোক্ষ অভিযোগ ছিল যে, তিনি ছাত্রদের নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটাচ্ছেন তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে। তৎকালীন তরুণদের যে অংশ বাবু কালচারে দীক্ষা পেয়েছিল তারা কেহই ডিরোজিওর শিষ্য ছিল না। তাদের অনেকেই ছিল মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত প্রহসন 'একেই বলে সভ্যতা'র নবকুমার চরিত্রের জাতি গোষ্ঠী। একথা সত্য যে, ডিরোজিওর শিক্ষাধীন হিন্দু কলেজের ছাত্রদের কেউ কেউ পুরাতন ও জীর্ণ মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখানোর

উগ্র ভাবে অতিরিক্ত মদ্যপান ও গোমাংস ভক্ষণ করার মতো আতিশয্য দেখিয়েছিল, কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই ধরনের বাহাদুরী দেখানোর ঘটনা নিতান্তই বিক্ষিপ্ত ও নগণ্য। ডিরোজিও স্বয়ং এই জাতীয় ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছিলেন ও প্রয়োজনে এইসব ছাত্রদের শালীনতার সঙ্গে ভর্ৎসনাও করেছিলেন কারণ বয়সে অতি তরুণ হলেও তিনি ছিলেন সংযমী, আত্মমর্যাদা ও শালীনতাবোধসম্পন্ন মানুষ।

প্রসঙ্গঃ আর একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, ইয়ংবেঙ্গল বা ডিরোজিওর হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মধ্যে যে আতিশয্য ও কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছিল তা ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের পর অর্থাৎ ডিরোজিওর হিন্দু কলেজ থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর। স্বভাবতই এই সময়ে ছাত্রদের উপর তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব কিছু শিথিল হওয়ার কথা। তা ছাড়া এই বৎসরের শেষ মাসে তিনি পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়ে গেলেন। কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা দিয়ে একটি সমাজকে বা শ্রেণীচরিত্রকে বিচার করা চলে না। অথচ তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ সেই প্রহসনের আশ্রয় নিয়েছিলেন ডিরোজিওকে ও ইংয়বেঙ্গলকে সমাজে হেয় করার জন্য। হিন্দু কলেজ থেকে তাঁকে বিতাড়ন করার জন্য যে হীন চক্রান্তের আশ্রয় নিয়েছিলেন হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ তা নিতান্তই কলঙ্কজনক ও হীনমন্যতার পরিচায়ক। রক্ষণশীল সমাজের এই বিকৃত মনোবৃত্তির পরিচয় রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্রের ক্ষেত্রেও আমরা পেয়েছি। ওই সমাজ রামমোহনের সতীদাহ বিরোধী আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে এবং ঈশ্বরচন্দ্রের বিধবা বিবাহ প্রচলনের প্রয়াসকে কার্যকারীভাবে প্রতিহত করার জন্য তাঁকে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও তাঁর উপর দৈহিক নির্যাতন চালানোর পরিকল্পনা করতে ইতস্ততঃ করেনি। কাজেই সে দিক থেকে আমরা ডিরোজিওকে অনেক

ভাগ্যবান বলবো, কারণ, তাঁকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করার প্রয়াস করেই রক্ষণশীলেরা ক্ষান্ত হয়েছিল, দৈহিক বা অন্য প্রকারের নির্যাতনের ষড়যন্ত্র তারা করেনি। নিন্দা ও অপপ্রচারে পঞ্চমুখ হলেও রক্ষণশীলদের ইতিহাস সর্বক্ষেত্রে প্রায় একই প্রকারের। তাই মানবপ্রেমিক অহিংসার পূজারী মহাত্মা গান্ধীকে রক্ষণশীল ঘাতকের গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছিল ; যীশুকে কাঁটার মুকুট পরে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করতে হয়েছিল তাঁরই স্বদেশবাসীর হাতে, ঈশ্বরের রাজ্য মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন বলে মানুষকে ভালবেসেছিলেন বলেই। কাজেই বিপ্লবী ডিরোজিওর জীবনে যা ঘটেছিল তা পুরাতন ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র, এবং পুনরাবৃত্তির অবসান হবে না, যতদিন না এই মানুষের মধ্যে শুভবুদ্ধি ও কল্যাণবোধ স্থায়ী আসন করে নেবে যতদিন না প্রগতিকে ঐতিহাসিক অনিবার্যতা বলে মনে করা হবে।

এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে বরখাস্ত করার পূর্বে শিক্ষা বিভাগের H. H. Wilson ডিরোজিওকে যে পত্র লিখেছিলেন তাতে তাঁর বিরুদ্ধে অনেকগুলি অভিযোগ উল্লিখিত ছিল। এইসব অভিযোগের মধ্যে অন্যতম অভিযোগ ছিল যে, তিনি ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহ পর্যন্ত সমর্থন করেন, হিন্দুছাত্রদের বিপথগামী করা ছাড়া। ফন্দীবাজ, হৃদয়হীন ও রক্ষণশীল হিন্দু নেতারা ভিন্ন সমাজের একটি অসহায় তরুণ শিক্ষককে হেয় ও অপমানিত করে বিতাড়নের জন্য কতখানি নীচে নামতে পেরেছিলেন, উপরোক্ত অভিযোগ থেকে একথাই প্রতীয়মান হবে। ডিরোজিও এই সব অভিযোগের উত্তরে উইলসন সাহেবকে যে মর্যাদাপুর্ণ আভিজাত্যপন্থী ও সাহসিক উত্তর দিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। প্রতিটি অভিযোগ তিনি যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা খণ্ডন করেছিলেন। স্বাধীন চিন্তা, ঋজু

দৃষ্টিভঙ্গী ও অনঢ় যুক্তিবাদই ডিরোজিওকে এইসব রক্ষণশীলদের কাছে পরম দোষে দোষী করে তুলেছিল। স্বাধীন চিন্তা বা স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য এঁদের নিকটে (হিন্দু ও খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায়ের) চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিলেন—তাই মিথ্যা অভিযোগ আনতেও এঁরা ইতস্ততঃ করেননি—নিজেদের পদমর্যাদা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও দায়িত্ব ভুলে। নির্ভীক ও স্বাধীন মতামতের জন্য ইংলণ্ডের রোমান্টিক যুগের বিদ্রোহী মহাকবি শেলীর ভাগ্যেও একই শাস্তি জুটেছিল। Necessity of Atheism শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশের অপরাধের জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র শেলীকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল। বিপ্লবাগ্নির পূজারীদের ভাগ্যে এমনটিই ঘটে থাকে। গণতন্ত্রের উপাসক স্বাধীন মতামতের পৃষ্ঠপোষক ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ও ছাত্রকবিকে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে দেয়নি—তাঁর কণ্ঠরোধ চেষ্টা হল তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করে। স্বাধীন মননে, চিত্তের নির্ভীকতায় ডিরোজিও ছিলেন মহাকবি শেলীর আত্মার আত্মীয়। এখানে বলা প্রয়োজন যে, এই দুই নির্ভীক তরুণ ইওরোপের রোমান্টিক যুগের প্রায় সমসাময়িক। শেলীর মতো ডিরোজিও ছিলেন একজন উদীয়মান কবি। তবে শেলী কবি হিসাবে ডিরোজিও অপেক্ষা অনেক বেশী সার্থক ও স্বীকৃত—অবশ্য ডিরোজিও স্বল্পায়ু হওয়ার জন্য তাঁর প্রতিভার যথার্থ স্ফুরণ ঘটে নি। তৎকালীন ইংলণ্ডে রোমান্টিক কবিদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় হয়ে উঠেছিলেন বিদ্রোহী তরুণ কবি শেলী—ত্রিশ বৎসরে পা দিয়ে পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পূর্বে। ডিরোজিও শেলীর মতো ছিলেন প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর, কল্পনার ঐশ্বর্যে ঋদ্ধিমান, স্পর্শকাতরতায় পরম অভিমানী। ইংলণ্ডের রোমান্টিক কবিদের (Wordsworth ব্যতীত) মতই ডিরোজিওর বিদ্রোহ ছিল তৎকালীন মূল্যবোধ ও আপ্তবাক্যের বিরুদ্ধে। ধরে নেওয়া হয়ত ভুল হবে না যে, পরম শিক্ষিত ও

ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত ডিরোজিও ইংলণ্ডের রোমান্টিক কাব্য ও কাব্যিক আদর্শ ও আঙ্গিক সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ধারণা সঞ্চয় করেছিলেন এবং কাজেই ইউরোপীয় কাব্যাদর্শের দ্বারা তাঁর প্রভাবিত হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। তবে এ সম্বন্ধে প্রামাণ্য তথ্যের স্বল্পতার জন্য এই অনুমানকে দৃঢ়ভাবে খাড়া করা যায় না। উল্লিখিত প্রভাব থাকুক বা নাই থাকুক একথা অনস্বীকার্য যে, বাঙলাদেশে পাশ্চাত্ত্যে অনুসৃত রোমান্টিক কাব্যাদর্শের ধারক ও বাহক ছিলেন ডিরোজিও—যদিও তাঁর কাব্যের মাধ্যম ছিল ইংরাজী ভাষা। এবং এই জন্য এক হিসাবে তাঁকে বাংলা ভাষার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের পূর্বসূরী বলা যায়। মধুসূদনের বাংলা গীতিকাব্য, বিশেষ করে 'ব্রজাঙ্গনা' ও 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিসিজিমের অনুপ্রবেশ বিশেষ লক্ষণীয়, আঙ্গিক ও দৃষ্টিভঙ্গী উভয়দিক থেকেই। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ (যা তৎকালীন নবজাগ্রত ব্যক্তি চেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য) যা রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর উৎসও এই উভয় কবির মধ্যেই সমানভাবে বিরাজমান। তবে একটা পার্থক্যের দ্বারা এই দুই কবি লক্ষণীয় ভাবে চিহ্নিত, মাইকেলের দৃষ্টি যেখানে প্রধানতঃ মানবমুখীন ডিরোজিওর মন সেখানে মূলতঃ প্রকৃতি-কেন্দ্রিক, মানুষের প্রতি গভীর প্রেম সত্ত্বেও। তাঁর কবিতায় প্রকৃতি অনেক বেশী মুখর—তাঁর বুদ্ধিমার্গী চিন্তাধারার মতই। তাঁর Maniac widow-তে বিধৃত প্রকৃতি প্রেম কাব্যে উল্লিখিত বিধবার দুঃখের সঙ্গে একাকার হয়ে এক অভিনবত্ব দান করেছে তাঁর এই সৃষ্টিকে, যদিও অল্প বয়সের ভাবোচ্ছলতা কাব্যে আঙ্গিকগত সম্পূর্ণতা দান করে নি। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর একাত্মতার আর একটি চিত্র Morning after storm-এ নিখুঁতভাবে অঙ্কিত :

ও কবিতার দুটি পংক্তি : There lay

Around me many a branch of

trees/scattered as leaves are by
the southern breeze/upon a
brook on an autumnal day.

মনে করিয়ে দেয় শেলীর বিখ্যাত কবিতার westwind-এর অনুরূপ অনেকগুলি পংক্তি যা ঝড়ের মহান বিধ্বংসী রূপকে করেছে অপরূপ ভাবে রূপায়িত। একথা সত্য অনুভূতির তীব্রতা ও কল্পনার ঐশ্বর্য কবির দৃষ্টিভঙ্গীকে মূর্ত করে তুলেছে এবং তিনি অধিকতর কাল বেঁচে থাকলে, তিনি তাঁর আঙ্গিকগত ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা কাটিয়ে উঠতেন বলেই মনে হয়, তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য বিচার করলে। অনেক অকথিত বাণী, অকথিত গীত ভাষা পেল না তাঁর স্বল্পমেয়াদী জীবনে। বুদ্ধি ও আবেগের এমন সুসমঞ্জস সমন্বয় খুব অল্প মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। একদিকে Enquirer-এর মতো সংবাদপত্রে তীক্ষ্ণ, তীব্র ও যুক্তিবাদী বৈপ্লবিক মত প্রকাশ করে সমগ্র বাঙলা সমাজে তীব্র আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন, অন্যদিকে Harp of India-র মতো কবিতা নিয়ে ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা ও আবেগ প্রকাশ করেছিলেন।

Silence hath bound thee with her fatal chain
Neglected mute and desolate art thou
Like monument on desert plain
...but it thy notes divine
May be mortal wakened once again

উল্লিখিত কাব্যাংশে একদিকে ভারতবর্ষের দুর্দশায় মর্মবেদনা অন্যদিকে ভবিষ্যতে জাগ্রত ভারতবর্ষের স্বপ্ন যে অপূর্ব দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে তা ডিরোজিওর গভীর ভারতপ্রেমেরই নির্দেশ করে। বিদেশী ফিরিঙ্গি ডিরোজিও ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলেই মনে করতেন। ডিরোজিওর এই ভারতপ্রেম ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের প্রতি মমত্ববোধ থেকে উৎসারিত হয়নি—উৎসারিত হয়েছিল নির্যাতিত

তমসাচ্ছন্ন একটি মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মতাবোধ থেকে। সেই মানবগোষ্ঠী জন্মসূত্রে কাছে পাওয়া ভারতের মানুষ। এখানে তাঁর কবিজনোচিত ভাবাবেগ ভিৎ খুঁজে পেয়েছে, তাঁর যুক্তিবাদী মনের শক্ত ও পাথুরে মাটিতে নৈতিক যুক্তিবাদী ও মুক্তমনা মানুষ, সমাজ ও সম্প্রদায় বিশেষের ও ভৌগোলিক গণ্ডীর সংকীর্ণতা ছাড়িয়ে উঠে, মানুষকে গ্রহণ করে মানুষ হিসাবে—জাতি ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে। যুক্তিবাদী রামমোহন রায়ও এইভাবে দেশ ও জাতির গণ্ডীকে অস্বীকার করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের আন্দোলনকে স্বাগত জানাতে পেরেছিলেন। ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা তাঁর মর্মপীড়া সঞ্চার করত। এদিক থেকে ডিরোজিও ছিলেন রাজা রামমোহনের অনেক কাছাকাছি, দৃষ্টিভঙ্গীর এই সাদৃশ্যের জন্য। বাঙালী ব্রাহ্মণ রামমোহন আর বিদেশী ফিরিঙ্গি ডিরোজিও একই ধ্যানের একই চিন্তার সূত্রে বাঁধা। অবশ্য একথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ হবে যে, এদেশে বসবাসকারী অনেক বিদেশী এদেশকে তাঁদের নিজেদের দেশ বলে মনে করতেন। জবচার্ণক থেকে কবিয়াল এন্টনী এদিক থেকে ডিরোজিওর সমগোত্রীয়। রামমোহন চেয়েছিলেন এই সব বিদেশীরা ইংরাজ ও পর্তুগীজ, ফরাসী ও দিনেমার ভারতবর্ষকে যেন নিজেদের দেশ বলেই মনে করে। ওরা জমিজমা দখলে নিয়ে এই দেশে বসবাস করুক এই কামনাই তিনি করতেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, যদি তারা এদেশকে নিজেদের দেশ বলে মনে করে তাহলে দেশীয়দের প্রতি বিজাতীয় মনোভাব হ্রাস পাবে এবং শোষণপ্রবণতা স্তিমিত হবে, এবং পরিণামে একটা সুস্থিতিগত ঐক্য গড়ে উঠবে এইসব বিভিন্ন কৃষ্টিসম্পন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে, ভারতবর্ষের প্রগতির চাকা সচল থাকবে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বারে বারে এই ঘটনাই ঘটে গেছে—তাতেই ভারতবর্ষের মিশ্রিত সভ্যতা ও সংস্কৃতি এত বৈচিত্র্যময় ও ঐশ্বর্যশালী।

ডিরোজিও ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলে মনে করেছিলেন বলেই বলতে পেরেছিলেন :

May be mortal wakened once again.

Harp of my country, let me strike again the strain

ভারতবর্ষের দুঃখে তাঁর বেদনাবোধ কেবল তাঁর কাব্যের মধ্যেই সুসমবদ্ধ ছিল না। তিনি তাঁর ছাত্রসমাজের মধ্যে এই বেদনাবোধ সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন, এবং এই বেদনাবোধ থেকে উপ্ত হয়েছিল রাজনৈতিক চেতনা ও স্বদেশ প্রেমে যারা মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন পরবর্তীকালে ডিরোজিওর শিষ্য ইয়ং বেঙ্গলের অন্যতম নেতা মহাবাগ্মী লালমোহন ঘোষ। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেতনার ক্রম অভিব্যক্তির ইতিহাসে এক অভিনব বৈশিষ্ট্য হোল বিদেশীর হাতে এদেশীয়দের স্বদেশচেতনার হাতেখড়ি। একদিকে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারে ডিরোজিওর বুদ্ধিমার্গী প্রয়াস অন্যদিকে ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসভা (Indian national congress) সৃষ্টিতে ইংরাজ রাজপুরুষ হিউমের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বিদেশী নারী এনি বেশান্ত, আইরিশ মহিলা মার্গরেট নোবেল, দেশ নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ইংরাজ সহধর্মিণী নেলী সেনগুপ্তার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান ভারতের মুক্তি আন্দোলনে বৈশিষ্ট্য দান করেছিল।

প্রকৃত মানবপ্রেমিকের কাছে দেশ ও জাতির বিভিন্নতা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না। এই কথাই বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে, কেবল ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে। বর্তমানে বিশ্বের সাম্যবাদী আন্দোলন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পূর্ব স্পেনীয় গৃহযুদ্ধ এই সাক্ষ্যই দেয়। যেখানে মানুষ নির্যাতিত, নিপীড়িত, মানবপ্রেমিক সেখানে ছুটে যায় নিজের জাতিগত ও সম্প্রদায়গত বিভিন্নতা ভুলে। ডিরোজিও ছিলেন এমনই একজন মানবপ্রেমিক।

এখন দেখা যাক্ ডিরোজিওতে এই মানবপ্রেম কোন মানসি-

কতা প্রসূত এবং এর উৎস কোথায়। আলোচনার সূচনাতেই বলা হয়েছে ডিরোজিও তাঁর শিক্ষক ড্রামণ্ডের কাছে পাঠ নিতে গিয়ে ব্যক্তি মানুষকে মূল্য দিতে শিখেছিলেন, ফলে, তাঁর চিন্তা হয়ে উঠেছিল মানবকেন্দ্রিক। ইউরোপীয় রেনেসাঁ বা নবজাগরণের মূলে ছিল ব্যক্তি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, চার্চের সর্বগ্রাসী সমষ্টিবাদী প্রভাব থেকে ব্যক্তি মানুষের তার নিজ সত্বায় ফিরিয়ে আনার প্রয়াস। ঈশ্বর ও পরলোক সম্বন্ধে নবজাগরণের ঋত্বিকদের মনে যে প্রশ্ন সংশয়, অনুসন্ধিৎসা জাগে সেই অনুসন্ধিৎসা থেকেই ব্যক্তি মানুষের মুক্তি চিন্তা স্বভাবতই উৎসারিত। কোনো একটি Hypothesis ভেঙে পড়লে সেই শূন্য পাদপীঠে গড়ে তুলতে হয় আর একটি Hypothesis—তাই চার্চ ও ঈশ্বরের আসনে এসে বসলো ব্যক্তিমানুষ, নবজাগ্রত বুদ্ধিজীবিদের পুরানো Hypothesis-এর মূল্যবোধের বিরুদ্ধে জেহাদের ফলে। ড্রামণ্ডের শিক্ষায় শিক্ষিত ফিরিঙ্গি ডিরোজিও এই একই ধরনের জেহাদ ঘোষণা করলেন তৎকালীন বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের বিরুদ্ধে। তবে এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ইউরোপের নবজাগরণের পুরোধারা ভাঙনের কাজ সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন বলেই ব্যক্তিমানুষ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল ঈশ্বরের শূন্য স্থানে। কিন্তু বাঙলায় নবজাগরণের পথ তৈরী করতে গিয়ে ডিরোজিও ভাঙনের কাজ শুরু করলেও সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। তিনি অনুসন্ধানই চালিয়েছিলেন, লক্ষ্যে পৌছতে পারেন নি। তিনি তৎকালীন তরুণ বাঙালীর মনে সংশয়ের কুঠারঘাত করে চলতি বিশ্বাস ও কুসংস্কারের আগাছা উচ্ছেদ করতে কিছু পরিমাণে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু নতুন কোনো মূল্যবোধের অঙ্কুরোদ্গম করতে পারেন নি। ঈশ্বর সিংহাসনে দুলে উঠলেন—হেলে পড়লেন, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সিংহাসনচ্যুত হলেন না। ব্যক্তি মানুষ তাঁর আসন কেড়ে নিতে

পারলো না—কেড়ে নেওয়ার মানসিকতা কিছু পরিমাণে সৃষ্টি হলেও। তাই ডিরোজিও দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হলে, ডিরোজিও হয়ত তাঁর আরব্ধ কাজ করতে পারতেন, ব্যক্তি মানুষকে বসাতে পারতেন ঈশ্বরের সিংহাসনে। কিন্তু তা বাস্তব হোল না। তাই তিনি আমাদের কাছে নিছক অনুসন্ধিৎসু ও চিরসংশয়ী বুদ্ধিজীবি হয়ে বেঁচে রইলেন, নূতন কোনো স্থায়ী মূল্যবোধের সন্ধান দিতে পারলেন না, যেমন দিতে পেরেছিলেন রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ডিরোজিও নিজেও উলসনের অভিযোগ-পত্রের উত্তরে বলেছিলেন, "কারো কাছে এমন মতামত প্রকাশ করিনি যাতে আমাকে নাস্তিক বলে মনে করা সম্ভব। তবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা নাস্তিকত্ব সম্বন্ধে মন খুলে আলোচনা করা যদি অপরাধ হয় তবে অপরাধী বলে নিজেকে দোষী করতে আমি কুন্ঠিত নই।" উপরোক্ত মন্তব্য থেকে একথাই প্রতীয়মান হবে যে, ডিরোজিও প্রকৃতপক্ষে ছিলেন একজন 'Free thinker' বা মুক্তমনা চিন্তাবিদ, যিনি মুক্ত মনে সব জিনিস যাচাই করে নিতে চেয়েছিলেন সত্যিকারের একজন চিরঅনুসন্ধিৎসু মানুষ হিসাবে। সত্যের পূজারীরা এমনই হয়। মতবাদের কোনো নির্দিষ্ট কাঠামোতে এঁদের চিরকালের জন্য বেঁধে রাখা যায় না। এ ধরণের Non conformism তাঁদের জীবনকে সদা চঞ্চল ও বেগবান করে রাখে। বিপ্লবী চিন্তানায়ক মানবেন্দ্রনাথ রায় ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর জীবনে একই ধরনের এই ইতিবৃত্তই সংঘটিত হতে দেখেছি। বিশেষ কোনো মতবাদের শীল মোহর দিয়ে মনের জানালা বন্ধ রাখলে সত্য চিরকালের জন্য দৃষ্টির অন্তরালে থেকে যায়। তাই সত্যের পূজারীরা সব সময়েই বেগবান ব্যক্তিত্বের পরিচয় রেখে যান—মহাকালের পদ প্রান্তে। ডিরোজিওর মুক্ত, স্বাধীন মনন তৎকালীন রক্ষণশীল শিবিরে ঝড়েরই সৃষ্টি করল—প্রশংসিত হল না। এটাই স্বাভাবিক

ছিল। তাঁকে সমাজবিরোধী, তরুণদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার বীজ বপনকারী ও নাস্তিক বলে চিহ্নিত করা হল। অথচ ডিরোজিওর প্রকৃতপক্ষে একমাত্র অপরাধ ছিল যে, তিনি Hypothesis বা গৃহীত সত্য ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে তরুণদের সজাগ করতে চেয়েছিলেন। তাদের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভার উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছিলেন—অবাধ আলোচনার মাধ্যমে। তিনি লর্ড বেকনের মতোই বিশ্বাস করতেন যে, কোনো কিছু দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করলে অনেক সময়েই ওই গৃহীত বস্তু বা তত্ত্বকে সত্য ও বাস্তবের আলোকে অস্বীকার করার ট্রাজেডি সহ্য করতে হয়। তাই কোনো কিছু গ্রহণ করার আগে সেই বস্তু বা তত্ত্ব যাচাই করে নিলে ট্রাজেডি এড়ানো যায়।

পূর্বে উল্লেখ করেছি, ডিরোজিও বিশেষ কোনো তত্ত্ব বা মতবাদকে তরুণদের উপর চাপিয়ে দিতে চাননি এবং একথা তিনি সজোরে ঘোষণা করেছেন উইলসনকে লিখিত তাঁর পত্রে। তিনি বলেছেন, "তরুণদের মনে কোনো নির্দিষ্ট বিশ্বাস সৃষ্টি করা কোনো দিন আমার উদ্দেশ্য ছিল না এবং সেটা আমার ক্ষমতার বহির্ভূত ব্যাপার।" নির্দিষ্ট কোনো বিশ্বাস সৃষ্টী করা নয়, গৃহীত বিশ্বাস ও আপ্তবাক্যের অচলায়তন যুক্তির প্রবল আঘাতে ধূলিস্যাৎ করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। চির-জিজ্ঞাসু ডিরোজিওর পক্ষে এটাই ছিল স্বাভাবিক। ডিরোজিও এই চিঠিতে লিখেছেন, "অনুসন্ধিৎসার অনন্ত সমুদ্রে দুর্জ্ঞেয় সত্যের দ্বীপে যাত্রা করাই জ্ঞানান্বেষণের শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে আমার ধারণা।" সত্যই ডিরোজিও ছিলেন 'দুর্জ্ঞেয় সত্য দ্বীপের' পথ যাত্রী। তিনি নির্ভিক নাবিকের মতো ওই দ্বীপকে জানতে এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই দ্বীপের দিকে যাত্রী অসমাপ্ত থেকে গেল—এই পৃথিবীতে তাঁর অল্পদিনের মেয়াদের জন্য। চির-জিজ্ঞাসু মনের যাত্রা কোনোদিনই থামে না। যে দিন সে থামে সেইদিনই দেখা দেয় তার মনের জড়ত্ব। ডিরোজিও সেই কথাই বিশ্বাস করতেন। বলাকায়

রবীন্দ্রনাথের অনুভূত সত্য এই সত্যেরই অনুরণন। জীবন স্তব্ধতায় নয়, স্থিতিতেও নয়, জীবন গতিতে। সত্যেরও সার্থকতা গতিতে, কারণ সত্য সবসময়ই রূপ পাল্টাচ্ছে। রূপ পরিবর্তনশীল বলে সত্যও পরিবর্তনশীল। সত্যের এই পরিবর্তনশীল চরিত্র ডিরো-জিওকে মূলতঃ সংশয়বাদী করে রেখেছিল, এবং তাঁর মনের এই সংশয়বাদী প্রবণতার মূলে রয়েছে দার্শনিক হিউমের অলক্ষ্য প্রভাব, ড্রামণ্ডের শিক্ষার মুক্ত বাতাবরণ। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজের পক্ষে সত্যের চরিত্রের এই পরিবর্তনশীলতা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না, তাই সত্যের অনুসন্ধানে ব্রতী এই তরুণ জ্ঞানপিপাসুকে বর-দাস্ত করা সহজ ছিল না। ইতিহাসে বারে বারে এর প্রমাণ পাওয়া গেছে—সক্রেটিস থেকে গ্যালিলিওরা বার বার শহীদত্ব বরণ করেছেন এই রক্ষণশীলদের বদ্ধ আদালতের রায়ে যা সত্যকে স্থিতিশীল ও শাশ্বত বলে মনে করে প্রগতির চাকাকে পদে পদে থামিয়ে রাখতে চায়। ইয়োরোপের নবজাগরণের প্রাক্‌কালে Counter reformation বা প্রগতি বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন এই রক্ষণশীল মানসিকতার অন্যতম প্রবল প্রকাশ। বাংলার নবজাগরণের শুভ মুহূর্তেও এমনটি ঘটেছিল। অবশ্য প্রকৃত Counter reformation (প্রতি সংস্কার আন্দোলন) ও Revivalism বা পুরাতন মূল্যবোধের হুবহু আবাহন ও গ্রহণ আন্দোলন বাংলায় শুরু হয়েছিল অনেক পরে ডিরোজিও ও রাম-মোহনের সময় নয়। ডিরোজিওর সময়ে তৎকালীন প্রগতিশীল শক্তির বিরুদ্ধে যে বিরোধী শক্তি মাথা চাড়া দিয়েছিল তা মধ্য-যুগীয় রক্ষণশীল নেতাদের প্রগতিবিমুখ জেহাদ মাত্র। রক্ষণশীল-দের এই আক্রমণ নতুন বা জন মূল্যান্বিত কোনো পুরাতন আদর্শ থেকে শক্তি সংগ্রহ করেনি। "নতুন কোনো পরিবর্তনকে স্বীকার কোরব না, সামাজিক স্থিতিশীলতাকে সম্পূর্ণভাবে অটুট রাখবো" সমাজের ভিৎ বা বহিরঙ্গ জীর্ণতার ঘুণে জীবনীশক্তি একেবারে

হারিয়ে ফেললেও—এই মনোবৃত্তি প্রবৃত্ত করেছিল তৎকালীন রক্ষণশীল নেতাদের প্রগতির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে, নতুবা তারা তরুণ ডিরোজিওর স্বাধীন চিন্তা ও মতামতে এতখানি ভারসাম্য হারাতেন না। মিথ্যা অপবাদ দিয়ে হিন্দু কলেজ থেকে তাঁকে বিতাড়িত করতেন না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল ইংলণ্ডে মহাকবি শেলীকে স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তাঁর মতামত (ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে) ছিল নির্দিষ্ট, নির্ভীক ও বিশেষ অবয়ব বিশিষ্ট—সেখানে সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিল না। তাই পাদ্রী বা যাজক শাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শেলীকে সহ্য করতে না পারাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু ডিরোজিও? ডিরোজিওর ঈশ্বর সম্বন্ধে বা অনেক পুরাতন সামাজিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে চিন্তা কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো আকার নিতে পারেনি। হয়ত তার আয়ুর স্বল্পতার জন্য। বিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে তাঁর একটি সত্যে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা ছিল মাত্র। অথচ বাংলার রক্ষণশীল সমাজ তাও সহ্য করতে পারলো না। তাঁর মাথার উপর চাপানো হোল মিথ্যা অপবাদের বোঝা। আর এই অপমান তরুণ ডিরোজিওর জীবনীশক্তি তিল তিল করে নষ্ট করলো। এলো তাঁর অকাল মৃত্যু, যেমন এসেছিল তরুণ কবি কীট্‌সের জীবনে। অপসমালোচনার তীব্রতা ও অপমান ক্ষয়-রোগগ্রস্ত কবির শেষ যাত্রা ত্বরান্বিত করলো। ফলে, ইংলণ্ডের রোমান্টিক কাব্য জগৎ ক্ষতিগ্রস্থ হোল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই।

ডিরোজিওর অকাল তিরোধান ইংরাজী কাব্যসাহিত্যের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকারক হয়েছিল তা বলা যায় না। কিন্তু তাঁর মৃত্যু তৎকালীন তরুণ বুদ্ধিজীবী সমাজকে অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ঠিক যে সময় বুদ্ধিমার্গী আন্দোলন সবে দানা বেঁধে উঠছে, সেই সময় ডিরোজিওর তিরোধান ঘটল।

নেতৃত্বহীন "ইয়ং বেঙ্গল" নাবিকহীন নৌকার মতো ইতস্ততঃ ভেসে চলল। ফলতঃ ডিরোজিও শিষ্যরা কিছুটা আতিশয্যের পরিচয় দিতে থাকলো কোনো কোনো সময়। দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত প্রহসন "সধবার একাদশী"র বুদ্ধিজীবী নিমচাঁদ চরিত্রকে ইয়ং বেঙ্গল সমাজের আতিশয্যদোষে দুষ্ট কোনো কোনো তরুণের উত্তরসূরী বলা চলে। প্রসঙ্গত এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই সমাজের আর একজন প্রতিনিধি ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁর বাড়ী থেকে সাময়িক অনুপস্থিতিতে তাঁর সহপাঠী কোনো কোনো অতি উৎসাহী তরুণ প্রতিবেশীর বাড়ীতে গরুর হাড় বা নিষিদ্ধ খাদ্যের ভুক্তাবশেষ ছুঁড়ে ফেলে অতি আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছিল, অবশ্য কিছুটা প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ মনোবৃত্তির বশীভূত হয়েই। কৃষ্ণমোহন এই কাজ কখনই সমর্থন করেননি, যেমন করেননি তাঁর গুরু ডিরোজিও। এই কৃষ্ণমোহনই পরবর্তীকালে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন এবং ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য ও চরিত্র বলের জন্য বুদ্ধিজীবী সমাজে বিশেষ আদৃত হয়েছিলেন। কাজেই দেখা যায়, ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের মধ্যে মুক্ত বুদ্ধি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তাদের বিপথগামী বা উচ্ছৃঙ্খল করতে চাননি এবং এদিক থেকে তিনি তাঁর শিক্ষক ড্রামণ্ডের ভাবনা বা মুক্ত চিন্তার ধারাবাহিকতাই অক্ষুন্ন রেখেছিলেন—যেমন রেখেছিলেন সক্রেটিসশিষ্য প্লেটো। ডিরোজিওর এই মুক্তবুদ্ধি ও অনুসন্ধিৎসা তাঁর যুক্তিবাদী মনের বহিঃপ্রকাশ। তৎকালীন তরুণ বাঙালীর নবজাগ্রত চেতনার মূলে ছিল যুক্তিবাদী প্রবণতা। আলোচনার সূচনাতেই বলা হয়েছে যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বা দ্বিতীয় দশকেই সর্বপ্রথম যুক্তিবাদকে হাতিয়ার করে মধ্যযুগীয় তমসায় আঘাত হানলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি বেদান্তের নতুন ভাষ্য লিখে আলোকিত করে তুললেন পৌত্তলিক হিন্দু সমাজের অন্ধকার

কোণগুলি। তাঁর অনুসন্ধিৎসা তৎকালীন গৃহীত আপ্তবাক্য ও চলতি মূল্যবোধগুলির বিরুদ্ধে প্রবলভাবে মুখর করে তুলল, অন্যদিকে এই অনুসন্ধিৎসাই তাঁকে সহায়তা করল নতুন মূল্যবোধ-সৃষ্টি করতে, যার ফলে হিন্দু সমাজ এক নতুন দিগন্তের সন্ধান পেল। যুগ যুগান্তের তমসা কাটতে শুরু করলো। এই মূল্যবোধ সৃষ্টির মূলে ছিলো রামমোহনের ব্যক্তি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও মানবপ্রেম। ডিরোজিওর চিন্তাধারা এই মানবপ্রেম থেকে উৎসারিত। এই কথাই সর্বাগ্রে মনে রাখা প্রয়োজন। তিনি পৃথিবীকে, মানুষকে ভালোবেসেছিলেন বলেই অতি মানবিক ও পারলৌকিক দিকগুলি তিনি নির্মমভাবে যাচাই করতে চেয়েছিলেন। অনুসন্ধিৎসু ও যুক্তিবাদী ডিরোজিও মানুষের কল্যাণকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন বলেই দেখা ও অদেখা সব সত্যকেই যাচাই করতে চেয়েছিলেন। নব জাগরণের এটাই সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। মনের বন্ধনমুক্তি ঘটানোই ছিল ডিরোজিওর জীবন সাধনা। তিনি বিশ্বাস করতেন, মন বন্ধনহীন হোলে নতুন স্বপ্নের, নতুন মূল্যবোধের চারা বপন করা সম্ভব হয়। আগাছা নির্মূল না করলে যেমন বাঞ্ছিত চারাকে রক্ষা করা যায় না, তেমনি কুসংস্কার ও অর্থহীন বিশ্বাসের আগাছার উচ্ছেদ ঘটাতে না পারলে সার্থক সৃষ্টির বীজ ছড়ানো যায় না। ছড়াতে গেলে তা হবে নিতান্তই সামর্থ্যের অপচয়। তিনি তাই সর্বাগ্রে চাইলেন কেমন করে তরুণ সমাজকে সংস্কার মুক্ত করবেন, বন্ধনহীন করবেন ও কেমন করে ঘটাবেন তরুণদের অন্তর্নিহিত প্রতিভার বিকাশ। তাই তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে এক যায়গায় বলেছেন, "পাখির ছানার মতো তোমাদের ডানা ঝাপটানো শুনছি আমি কান পেতে আছি কবে নীড়ের বন্ধন ছেড়ে মুক্ত ডানায় ভর দিয়ে উধাও হবে তোমরা অনন্ত আকাশের সীমানা সন্ধানে।' এই উক্তির মধ্যে আমরা যেন মহাকবি শেলীর সেই অসীমের সন্ধানী মনের

পরিচয় পাই, যে মন ভরত পাখির মতো পাখায় ভর করে উড়ে দূর দিগন্তের পারে মুক্তির সন্ধানে, অমৃতের সন্ধানে দিশাহারা। এই দুই কবির মধ্যেই আমরা পাই বন্ধন মুক্তির প্রতি অন্তরের অনন্ত আকুতি। এই আকুতি আধ্যাত্মিক ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন মনের জাগতিকতা থেকে মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা নয়। এই আকুতি সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মনের মুক্তির জন্য বেদনার্ত প্রার্থনা। দুটি বিদ্রোহী মন সারা জীবন ধরে ভরত পাখির মতোই ডানা ঝাপ-টিয়ে বন্ধন মুক্তির গান গেয়ে গেছে বন্দী প্রমথিয়ুসের মতো তাঁদের আলোর জন্য, আগুনের জন্য প্রার্থনা। তবে দু'জনের প্রার্থনায় মধ্যে পার্থক্য এইখানে—শেলী যেখানে অনুভূতির তীব্রতায়, বন্ধনের যন্ত্রণার ভাবাবেগে প্লাবিত হয়েছেন, গীতিকাব্যের মাধ্যমে আপন অন্তরের ব্যথা উজাড় করে দিয়েছেন, ডিরোজিও সেখানে কবি মানসিকতা সত্বেও যুক্তিবাদের আশ্রয়ে বন্ধনমুক্তির যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন, ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতার দাবী করতে চেয়েছেন বিশ্লেষণ শল্যাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করতে চেয়েছেন প্রচলিত সংস্কারের বন্ধনকে ও পুরাতন মূল্যবোধগুলিকে, যা জগদ্দল পাথরের মতো সমাজ-বুকে বসে থেকে প্রগতির পথকে প্রতিহত করছিল, প্রতি পদে, প্রতি মুহূর্তে। ডিরোজিও এই জগদ্দলকেই সরাতে চেয়েছিলেন—যাতে প্রগতির রথ চলতে পারে অব্যাহত ভাবে—সব প্রতিরোধ তুচ্ছ করে। ডিরোজিওর অকাল মৃত্যুতে এই রথ ঠিক সহজ ও সরল পথে চলতে পারলো না। নানা বিরোধী শক্তি চলার পথে বাধার পর বাধা সৃষ্টি করে চলছিল। কিন্তু ডিরোজিও যে পথ প্রস্তুত করে গেলেন তা যথার্থ প্রগতিবাদী ও মুক্তমনা মানুষের চলার পক্ষে পরম সহায়ক হয়ে উঠলো। তাই আমরা পেলাম বাগ্মী দেশপ্রেমিক লালমোহন ঘোষ, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কিছুদিন পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো মহাতেজস্বী সংস্কারমুক্ত এমন এক বিরাট পুরুষকে যিনি

ছিলেন ভারতের মাটিতে এক বিশেষ ব্যতিক্রম। হিন্দু কলেজে পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি ডিরোজিও স্বাধীন চিন্ততা, সংস্কারমুক্ত ও যুক্তি-বাদী চিন্তার যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করলেন তা সংস্কৃত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রে ক্রমে পূর্ণতা পেল। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী বাঙালী জাগ্রত হোল নিজের পরিস্থিতি সম্বন্ধে। মেজাজ ও চিন্তার দিক থেকে ডিরোজিও ও ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে ছিল এক অপূর্ব সাদৃশ্য। দুই জনেই চাইতেন প্রতিটি Hypothesis-কে জিজ্ঞাসার অনুসন্ধিৎসার ধারালো অস্ত্রে বিশ্লেষণ করে নিতে, যুক্তির কষ্টিপাথরে প্রতিটি তত্ত্বকে চাইতেন যাচাই করতে। মানসিকতার দিক থেকে দুজনেই ছিলেন সংশয়-বাদী। তাই গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হয়েও ঈশ্বরচন্দ্র ঈশ্বরকে গৃহীত সত্য বলে স্বীকার করেছেন এমন বিশেষ প্রমাণ কোথায়ও রেখে যাননি। আবার এমন নজীরও কোনো স্থানে রেখে যান নি, যা থেকে দ্বিধাহীনভাবে প্রমাণ করা যায় যে, তিনি ছিলেন একজন কট্টর নাস্তিক। ডিরোজিওর ঈশ্বরচন্দ্রের মতোই ছিল এমন খোলা ও মুক্ত মন। তাই তিনি প্রশ্ন রেখে গেছেন জীবনে চলার পথের প্রতিটি ফলকে এবং তাঁর যুক্তিবাদী মন জীবনের প্রতিটি কর্মে প্রতিফলিত হয়েছে—যেমনটি হয়েছে ঈশ্বর-চন্দ্রের ক্ষেত্রে।

যুক্তিবাদের এই ধারাবাহিকতা রামমোহন ও ডিরোজিওর জীবন ও কর্মে, উৎসারিত হয়ে ঈশ্বরচন্দ্রে এসে পূর্ণতা পেল—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঈশ্বরচন্দ্রের পর যুক্তিবাদের গতি ব্যাহত হোল, ফলে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার শেষ কয়েক দশকে প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধী শক্তি সদ্য জাগ্রত তরুণদিগকে বিভ্রান্ত করলো—Revivalism-কে রেনেশা বলে তারা ভুল করলো—এইসব বিভ্রান্ত তরুণেরা।

ডিরোজিওর চিন্তা ও ভাবনা নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু সেপথ নিশানা হারিয়ে ফেললো—একদিকে সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ সৃষ্ট না হওয়ার জন্য অপর দিকে প্রতি-সংস্কারী আন্দোলনের তীব্র প্রতিরোধের ফলে।

মানবতাবাদী মধুসূদন

যে সময়ে ভারতবর্ষে যুক্তিনিষ্ঠ সমাজবিপ্লবী বিশ্বপথিক রামমোহন খ্যাতির মধ্য গগণে সেই সময়ে যুগন্ধর মহাকবি উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার মানবতাবাদী মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ শে জানুয়ারী বাঙলার এক অভিজাত কায়স্থ পরিবারে রূপার চামচ মুখে দিয়ে পৃথিবীর প্রথম আলোক দেখেছিলেন এই একরোখা মানুষটি যিনি সত্যের জন্য, আপন জীবনবোধে বিশ্বস্ততার জন্য ওই রূপার চামচ অবহেলায় দূরে ফেলে দিতে দ্বিধা করেননি কৈশোরেরই প্রথম অধ্যায়তেই। মাইকেল আমাদের কাছে একজন কবি, মহাকবি এবং এইরূপেই তাঁর আমরা মূল্যায়ণ করি প্রতি বৎসর তাঁর আবির্ভাব ও তিরোধান দিবসে। সাধারণত কোন বস্তু বা মানুষের আমরা মূল্যায়ণ করি চিরাচরিত ধারায় বিশেষ একটা প্যাটার্ণ অনুসরণে এবং এর ব্যতিক্রম ঘটলেই আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসোয়াস্তি বোধ না করে পারি না। কিন্তু ভবিষ্যতের কাছে যদি আমাদের খাঁটি থাকতে হয় উত্তরসূরীদের যদি যথার্থ পথের সন্ধান দিতে হয়। তাহলে অতীতের যথার্থ রূপটিকে আমাদের আবিষ্কার করতে হবে—কোন প্রকার অন্ধবিশ্বাসকে কোন প্রকার মমতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে।

মাইকেল এক মহান প্রতিভাধর কবি নিঃসন্দেহে, কিন্তু তিনিও তৎকালীন বাঙলার সমাজ মানবেরই প্রসূন মানবতাবাদী ও যুক্তিবাদী রামমোহনের উত্তরসূরী নবপথ সন্ধানী বাঙলার সন্তান এই মাইকেল। ভারতবর্ষের যুগ যুগান্তরের সঞ্চিত ঘন তমসা

ভেদ করে নতুন চিন্তার আলো যখন সবে চমক সৃষ্টি করছিলো জাতির মানসকালে, ঠিক সেই সময়েই আমরা পেলাম মাইকেলকে। রামমোহনের যুক্তিবাদের আঘাতে, ডিরোজিওর বৈজ্ঞানিক মানসিকতার বিধৃত তত্বানুসন্ধানী দূরপ্রসারী আলোকে ধীরে ধীরে অপসৃত হতে লাগলো বহুদিনের তমসা। এই আলোকে বাঙলার মানুষ দেখলো নিজের স্বরূপকে তার অতীত ও বর্তমানকে—বোধ করলো নতুন ভবিষ্যত সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাকে। যে মূল্যবোধগুলি এতদিন অতি পবিত্র ও শাশ্বত বলে পরিগণিত হয়ে এসেছিল, সেগুলির উপর আঘাত এলো প্রচণ্ডভাবে।

তৎকালীন ইংরাজী শিক্ষিত নবজাগ্রত শ্রেণীর কাছে পুরানো ঐতিহ্য তার অনেকখানি সারবত্তা হারিয়েছিল, হারিয়েছিল তার গতিশক্তি অতএব তা পরিত্যজ্য। ব্যক্তিমানুষ যে প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বড়, মূল্যবোধ ব্যক্তিমানুষেরই জীবনকেন্দ্রিক, এ সত্য ধীরে ধীরে প্রতীয়মান হতে থাকলো এই নবচেতনা উদ্বুদ্ধ শ্রেণীর কাছে। মাইকেল ছিলেন এই শ্রেণীরই প্রতিনিধি তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্বকে নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন পরিপাক করেছিলেন তার সারাংশকে।

পিতার শাসন ও আকুতি, মাতার অশ্রুজল ও গভীর স্নেহ তার বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গকে প্রশমিত করতে পারেনি। তিনি গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এলেন এবং এই বেরিয়ে আসার উপর অনেক ব্যাখ্যা আছে। কেউ তাকে অভিযুক্ত করেছে এই বলে যে তিনি বিদেশী রমনী বিবাহের জন্য ও বিদেশে যাওয়ার সুবিধার জন্য নিজের সমাজ ত্যাগ করেছিলেন। আবার কেউ বা বিশেষ করে কোন ভারত প্রেমিক বিদেশী যাজক বলতে সুরু করেছেন খ্রীষ্টান ধর্মের জন্যে তিনি মনের খোরাক পেয়েছিলেন বলেই নিজের সমাজ ও ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টের আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই প্রকারের অনেক মত অনেক বিসম্বাদ সৃষ্টি হয়েছে মাইকেলের জীবন ও

জীবনবেদকে কেন্দ্র করে। কিন্তু কোনটি সত্য? এবং এর একটিও সত্য কিনা এই প্রশ্ন আমাদের আজ নতুন করে ভেবে দেখতে হবে, নতুন করে পেশ করতে হবে আধুনিক যুগের মানুষের কাছে। মাইকেলের সমগ্র জীবন ও সাহিত্যের নব মূল্যায়ণ করতে হলে এই প্রশ্নের পর্য্যালোচনা অবশ্যম্ভাবী।

অন্যায়, অবিচার, সামাজিক কুসংস্কার ও অর্থহীন বন্ধন তাঁর জন্মগত বিদ্রোহী মনকে অশান্ত করে তুলেছিল। মনে প্রাণে তিনি আপোষহীন ও নিজ বিবেকের কাছে খাঁটি ছিলেন বলেই প্রতিপদে তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন। অবশ্য মধুসূদনের পাশ্চাত্য শিক্ষিত সংস্কারমুক্ত মনের পক্ষে এই ধরনের মানসিকতাই আশা করা ছিল স্বাভাবিক। তিনি জানতেন তাঁর এই বিদ্রোহ তাঁর রক্ষণশীল শাসননিষ্ঠ পিতা সন্তান স্নেহ সত্বেও কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না। এবং একথা জানা সত্বেও তিনি বিদ্রোহ করলেন। এইখানেই তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচয়। তিনি বুঝেছিলেন হিন্দুধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তাঁর বিদ্রোহ হবে নিরর্থক, ব্যক্তি স্বাধীনতা ব্যাহত হবে প্রতিপদে। তাঁর শিক্ষা, দীক্ষা, বিবাহ ও ভবিষ্যৎ বন্ধক দিতে হবে আচার সর্বস্ব অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের কাছে। রাজনারায়ণ দত্ত কেবল তাঁর পিতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন সমাজপতি। কাজেই তাঁর পক্ষে অবাধ্য, বিদ্রোহী সন্তানকে ত্যাগ করতে বাধবে না, যতই না থাকুন কেন সন্তান স্নেহ। তাই মধুসূদনের খ্রীষ্টান হওয়ার পর তিনি তার পড়ার যাবতীয় খরচ প্রথম দিকে বন্ধ করে দিলেন। শিক্ষার জগতে ছেদ পড়লো, বিশপ কলেজ ছাড়তে হোল। বিবাহকে মধুসূদন মনে করতেন একটি ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে আর একটি ব্যক্তিমানুষের সার্বিক সংযোগ বা সংযুক্তি আর সংযোগ বা সংযুক্তি সার্থক হয় উভয়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক অধ্যাত্ম ও বুদ্ধিমার্গীয় সাযুজ্যের সম্ভাবনা থাকলে। তৎকালীন হিন্দুসমাজে এই ধরনের সাযুজ্য সংস্থাপনের

সন্ধান মধুসূদন পাননি, এবং তাঁর বা তাঁর সমদর্শী কোন হিন্দু তরুণের পক্ষে সেই সন্ধান পাওয়া সম্ভব ছিল না, ওই সমাজের অনগ্রসরতার জন্য। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা দেবকীর মধ্যে মধুসূদন তাঁর মানসীকন্যাকে খুঁজে পেয়েছিলেন বলেই বিবাহের মাধ্যমে তাঁর সাযুজ্য খুঁজেছিলেন, অবশ্য কৃষ্ণমোহন শেষপর্যন্ত এ বিবাহে রাজী হননি। নিজের চোখের নেশা বা সাধারণ তরুণ সুলভ প্রেম বা কামনা দেবকীকে বিবাহ করতে বা সেজন্য ধর্মত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করেনি। আবার একথাও অস্বীকার করা যায় না যে মাইকেলের কোন লেখা বা উক্তিতে এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায়না যে তিনি আধ্যাত্মিক মতের আশায় খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তবে একথা ঠিক যে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ফলে জীবনসাধনায় একটা প্রশস্ত পথের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত (পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ) যে মানসিকতার জন্য তৎকালীন প্রগতিবাদী ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে স্বীয় মনের খোরাক খুঁজেছিলেন। ঠিক সেই মানসিকতার জন্য মধুসূদন অপেক্ষাকৃত উদার খ্রীষ্টীয় সমাজে খুঁজে পেয়েছিলেন মানবিক মূল্যবোধের নানা উৎস। এই সমাজ মানুষকে নিছক মানুষ হিসাবে চিনতে সাহায্য করেছিল যেমন ব্রাহ্ম সমাজ বিবেকানন্দকে তাঁর মানসিক ভিৎ প্রস্তুতিতে সহায়তা করেছিল। ফলে পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ তার মোহমুক্ত সংস্কার মোহমুক্ত মন নিয়ে, আচার অনুষ্ঠানকে পেছনে ফেলে জীবের মধ্যে শিব খুঁজে পেয়েছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে দীক্ষিত হওয়ার পর। দুইজনের মধ্যে একটা বড় সাদৃশ্য এইখানে যে দুইজনেই মানুষকে অনুষ্ঠান সর্ব্বস্ব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিছক মানুষ হিসাবে দেখতে ও দেখাতে চেয়েছিলেন, যদিও তাঁদের দেখার ধরণ ছিল ভিন্ন।

মধুসূদনের সাহিত্যে কাব্য ও নাটকে মানুষকে মানুষ হিসাবে

দেখলাম। তাঁর সাহিত্যে মানুষ এলো তার ভাল ও মন্দ নিয়ে—তার সরলতা ও দুর্বলতা নিয়ে। আর কেবল মানুষ নয়, মধুসূদনের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী দেবতা ও দানবকেও মানুষের পর্যায়ে নিয়ে আসতে সহায়তা করলো। ভারতীয় সাহিত্য জগতে এই দৃষ্টিভঙ্গী নিতান্তই বৈপ্লবিক যেমন বৈপ্লবিক ছিল বিবেকানন্দের আচার ও অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে জেহাদ। ভারতবর্ষের জাতীয় মহাকাব্য এক নতুন ভাষ্য পেল বিপ্লবী মধুসূদনের প্রয়াসের ফলে। রামায়ণের রামচন্দ্র দেবদুর্লভ গুণের অধিকারী হয়ে নয়, আমাদের অনেক দেখা সাধারণ মানুষ হিসাবে তিনি দেখা দিলেন দেবতার গদি ছেড়ে। মানুষের ভুল ত্রুটি ও দুর্বলতা নিয়ে আবির্ভূত হলেন মধুসূদন সাহিত্যে। হিন্দু মধুসূদনের পক্ষে এই বিপ্লব সম্ভব ছিল না—সম্ভব্য হোল খ্রীষ্টান মাইকেলের পক্ষে। সমাজের মধ্যে ডুবে না থেকে, সমাজের বাইরে থেকে তিনি সমাজকে দেখেছিলেন বলে ব্যক্তি মানুষ তার প্রকৃত সত্বা নিয়ে তাঁর মুক্ত মনের দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছিল। নতুবা আজও পর্যন্ত 'রামনাম সত্য' বাক্যটি সাহিত্য জগতে জগদ্দল পাথর হয়ে থেকে আমাদের রস-বোধকে ব্যাহত করে রাখতো। যেমন রামচন্দ্রের কাছে, তেমনি রাবণের ক্ষেত্রেও মধুসূদন একই দৃষ্টিকোণের পরিচিতি রেখেছেন। আমরা এতদিন দেখেছিলাম রাবণকে রক্তপিপাসু বিবেক বর্জিত রাক্ষস হিসাবে। কিন্তু মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যে আমরা রাবণকে পেলাম স্নেহপরায়ণ পিতা হিসাবে, পত্নীপরায়ণ স্বামী হিসাবে, দেশপ্রেমিক ব্যক্তি হিসাবে। রাক্ষস রাবণ চরিত্রের এই নবরূপায়ন তৎকালীন সংস্কারচ্ছন্ন হিন্দু সমাজের মধুসূদনের পক্ষে সম্ভব ছিল না, সম্ভব হয়েছিল অপেক্ষাকৃত মুক্ত খ্রীষ্টীয় সমাজের মাইকেলের পক্ষে। এদিক থেকে বিচার করলে মাইকেলের জেহাদ (তাঁর সমাজের বিরুদ্ধে) হয়েছিল সার্থক। একদিকে যেমন খ্রীষ্টীয় সমাজের হাওয়া অন্যদিকে পাশ্চাত্য জগতের বিশেষ করে

ইংলণ্ডের রোমান্টিক যুগের আবহাওয়া ও গ্রীক মহাকাব্যের চরিত্র ও বিষয়বস্তু মধুসূদনের সাহিত্য মানস প্রস্তুতির সহায়তা করেছিল বিশেষভাবে। গ্রীক মহাকাব্যের দেবদেবীরা জাগতিক মানব মানবীরই দৈব সংস্করণ মানব মানবীর মতই তাদের প্রেম ও দ্বেষ, ভালবাসা ও হিংসা কৃতজ্ঞতা ও প্রতিহিংসা পরায়ণতা। তাদের সংকীর্ণতা ও প্রতিশোধ পরায়ণতার শিকার হোল পৃথিবীর মানুষ যারা অনেক সময় জানতেও পারে না তাদের দুর্ভাগ্যের কারণ বা Nemesis অবশ্য ভারতীয় পুরাণে এইধরণের Nemesis-এর পরিচয় একেবারে নেই তা নয়। সহনীয়তা ও দুর্বলতা মাইকেল আরোপ করেছেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে এবং এর কারণ তার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দেবদেবীকে তিনি মানুষের পৃথিবীতে নিয়ে এলেন, তাদের মধ্যে সৃষ্টি করলেন মানবিক সত্তা। দেবদেবীর উপর এইসব মানব গুণের আরোপন, মঙ্গলকাব্যে একেবারে নেই এমন নয়। কিন্তু মধুসূদন যেভাবে দেবদেবী রাক্ষস রাক্ষসী, দানব দানবীকে অতি মানবিক জগতের বাসিন্দাদের মানবিক পৃথিবীর আবহাওয়ায় নিয়ে এলেন, তা নিতান্তই অভূতপূর্ব। মধুসূদন রাবণ চরিত্রকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে অঙ্কিত করেছেন তা আর্য্য হিন্দু ভারতবর্ষের পক্ষে পরিপাক করা শক্ত, অথচ তা পরম উপভোগ্য দ্রাবিড় ভারতীয়দের কাছে।

রাবণের পুনর্বাসন ও রামচন্দ্রের মানবীকরণ প্রথম সম্ভব হয়েছিল মাইকেলের মহাকবি সুলভ দৃষ্টিকোণ সঞ্জাত প্রয়াসে। মহাকবিরা যে দ্রষ্টা তার একটি অবিসম্বাদিত প্রমাণ মাইকেলের মেঘনাদবধকাব্য। মাইকেল কোন রাজনৈতিক আদর্শদ্বারা চালিত হননি এবং তৎকালীন রাজনৈতিক চেতনাহীন ভারতবর্ষে এইভাবে চালিত হওয়া সাধারণভাবে সম্ভবও ছিল না। অবশ্য রামমোহন ছিলেন এর একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা যখন মধ্য গগণে তখন থেকে প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্য

ধীরে ধীরে রাজনৈতিক চেতনায় অনুপ্রবেশ ঘটলো। যাইহোক, রাজনৈতিক সচেতনতা না থাকলেও মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ রাম ও রাবণের নবমূল্যায়নে সহায়তা করেছিল।

রাজনৈতিক ঘটনা পরবর্তীকালে যতই ঘটুক না কেন মাই-কেলের রোমান্টিক কবি মানস ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অন্ধ মমত্ববোধের বিরুদ্ধে জানিয়েছিল এক বিরাট প্রতিবাদ। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই আর তারই ফলে মেঘনাদবধ কাব্য সর্বভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণের অধ্যায় বিশেষের হুবহু প্রতিনিধি হয়ে উঠেনি, হয়ে উঠেছে একটি মৌলিক ও মহান সৃষ্টি যা আজও গৌড়জনকে নিরবধি অমৃত বিতরণ করে চলেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মাইকেলের আগে ও পরে আজও পর্যন্ত রামায়ণের কোন বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে মেঘনাদবধের মত মহাকাব্য বা খণ্ড কাব্যের আকারে মৌলিক কোন শিল্পকর্মের সন্ধান আমরা পাইনি। আর এক বিদ্রোহী রোমান্টিক কবি ইংলণ্ডের শেলীর মধ্যেও এমনই একটি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আমরা পাই। তার প্রমিথিউস দেবভাণ্ডার থেকে আগুন চুরি করে মানুষের কল্যাণ সাধন করতে চেয়েছিল নিজের স্বাধীনতা বিপন্ন করেও আর বাঙলার মাইকেল প্রমিথিউসের মতই সাহিত্যের মাধ্যমে অমৃত পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন চিরাচরিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, অর্থহীন ঐতিহ্যের Myth-কে আঘাত করে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বৈপ্লবিক বলেই স্বীকৃত ঐতিহ্যকে তিনি অন্ধভাবে স্বীকার করে নেন নি। অথচ মনে প্রাণে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী, দেশের সংস্কৃতি ও দেশের মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা। ভালবাসা ছিল বলেই Captive ladysস্রষ্টার পক্ষে তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য ও ব্রজাঙ্গনা কাব্যের জগতে চলে আসা ছিল স্বাভাবিক। বিদেশী পোষাক বিদেশী জীবন যাত্রা প্রণালী তাঁর খাঁটি ভারতীয় সত্বাকে চাপা দিয়ে

রাখতে পারেনি যেমন পারেনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের খাঁটি দেশী পোষাক ও চাল চলন তাঁর অসাধারণ যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত ইউরোপীয় মনকে।

মাইকেল দৃষ্টিকোণ থেকে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা চালিত হয়ে ভারতীয় ধ্রুপদী বিষয়বস্তুকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে পরিবেশন করেছেন গৌড়জনের কাছে এবং এই পরিবেশন সম্ভব হয়েছে। কারণ তাঁর মনের ভারতীয় বনিয়াদের উপর দাঁড়িয়েছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবিত জীবনচর্য্যা। তাঁর মানসিক কাঠামোয় এই দ্বৈত সত্বার নিদর্শন তাঁর দুখানি কাব্যে মহাকাব্যধর্মী খণ্ড কাব্য মেঘনাদবধ কাব্য বিষয়বস্তুতে দৈবী ও ধ্রুপদী হলেও মেজাজে রোমান্টিক, আস্বাদে মানবিক আর ব্রজাঙ্গনা কাব্য কাঠামোতে পাশ্চাত্যধর্মী, তার ছন্দ ইটালীদেশীয় কাব্য অনুসৃত Attavenil ছন্দের অনুসরণ। যদিও এ কাব্যের সাবলীলতা বাঙলায় মধ্যযুগীয় বৈষ্ণবগীতি কবিতার কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। পরম ঐশ্বর্য্যময় মেঘনাদবধ মহাকাব্যের পাশে নিরাভরণ, অনাড়ম্বর, ঘরোয়া পরিবেশ স্মারক ব্রজাঙ্গনা কাব্যের রস পরিবেশন সত্যই এক বিস্ময়কর বস্তু। মাইকেলের প্রতিভা বৈচিত্রের এ এক অপূর্ব নিদর্শন। ব্রজাঙ্গনা কাব্যে ভাবব্যঞ্জনা বৈষ্ণব মহাজনদের আকুলতার কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয় প্রতি পদে প্রতি ছন্দে। ব্রজাঙ্গনা কাব্য কবির নির্ভেজাল গীতি কবি মানসিকতার অকৃত্রিম প্রতিফলন, এবং মনে হয় একমাত্র উদাহরণ। বাঙলায় গীতি কবি ঐতিহ্য যা ধারাবাহিক চলার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর রূঢ় বাস্তবতায় এসে তার ছুলছুল তান হারালো। সেই তান যেন আবার ফিরে এলো মাইকেলের এই নতুন আঙ্গিকবদ্ধ Ode জাতীয় কাব্যস্তবক ব্রজাঙ্গনা কাব্যে। বাঙলার গীতিকাব্যের অর্গল আবার নতুনভাবে উন্মুক্ত হোল। এই পথ ধরে এলেন কিছুদিন পরে মাইকেলের যোগ্য উত্তরসূরী বিহারীলাল চক্রবর্তী।

তবে একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ব্রজাঙ্গনা কাব্যে কবির ব্যক্তিগত Emotion অনেকটা নেপথ্যে রয়ে গেছে সাধারণভাবে। কবির ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিক ভাবাবেগ তাঁর সনেট জাতীয় গীতি কবিতায় যেমনটি প্রত্যক্ষভাবে পরিবেশিত হয়েছে, তেমনটি হয়নি বা হতে পারেনি Ode জাতীয় উল্লিখিত গীতিকাব্য স্তবককে। ছন্দগত সাবলীলতায় ও রচনার প্রসাদগুণে একদিকে যেমন মাইকেল বৈষ্ণব মহাজন পদকর্তাদের যোগ্য উত্তরসূরীর কাজ করেছেন অন্যদিকে তাঁদের অনেকের মত রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে বাস্তব পৃথিবীতে নামিয়ে এনে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন, এবং সেই বিচারের সার্থক ফলশ্রুতি এই অমৃতরসস্নিগ্ধ গীতিকাব্য। এ কাব্যে মধুসূদনের বিপ্লবী সত্বাকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করতে হয়নি স্বকীয় মানসিকতার বৈশিষ্টের জন্য। মধ্যযুগীয় বৈষ্ণবীয় মানবিক ঐতিহ্য তাঁর কাজকে সহজতর করে তুলেছে। এমনটি কিন্তু ঘটেনি বীরাঙ্গনা কাব্যে। বীরাঙ্গনা কাব্যে কবির মৌলিক প্রতিভাকে সম্পূর্ণ নতুন খাতে চলতে হয়েছে আয়াসের সঙ্গে। এই কাব্যের ছন্দ প্রকৃতি অমিত্রাক্ষর জাতীয়, চরিত্রগুলি ভারতের ধ্রুপদী সাহিত্য রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ থেকে গৃহীত হলেও রসাবেদনে সম্পূর্ণ মধুসূদনীয় অর্থাৎ মৌলিক ও রোমান্টিক বীরাঙ্গনা কাব্যে প্রতিটি নারী চরিত্র মধুসূদনের মৌলিক ভাবনার ফসল। এরই প্রত্যেকে নিজের ভাগ্যে জয় করার ক্ষমতায় বিশ্বাসী। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের রোমান্সবহ শক্তি মানুষকে দিয়েছিল পরম স্বীকৃতি। মানুষ যন্ত্রবিশেষ নয়; সমাজের ছাঁচ ঘেরা ঘরে ভঙ্গুর খেলার পুতুল নয়—এই সত্য নতুন করে পরিবেশিত হয়েছিল তৎকালীন ইউরোপে কবি শিল্পী ও সাহিত্যিকদের শিল্পকর্মে। মাইকেল রোমান্সবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন বলেই তাঁর ভাবনায় তাঁর ধ্যানে ব্যক্তি সত্বার ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বীকৃতি সাধারণভাবে ও স্বাভাবিকভাবে এসে পড়েছিল এবং এর ফলশ্রুতি হোল বীরা-

ঙ্গনা কাব্য সেখানে দেখি তারা, সূর্পনখা, ভানুমতী, সাধারণভাবে জাহ্নবী ও উর্বশীর মত চরিত্রগুলি। আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা এই সব নারী চরিত্রকে দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম, আমাদের সেই দৃষ্টি-ভঙ্গীর উপর মাইকেল হানলেন প্রচণ্ড আঘাত। সূর্পনখা আর আমাদের কাছে নিছক রাক্ষসী হয়ে দেখা দিল না। তার মধ্যে দেখলাম এক মানবিক রূপ মানবীয় সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার স্বাভাবিক প্রতিফলন। ঋষিপত্নী তারা অথবা বহুবল্লভা উর্ব্বশী ঠিক একই আলোকে আমাদের কাছে প্রতিফলিত হয় আমাদের অভ্যস্ত ধারণায় পৃথিবীতে তোলপাড় সৃষ্টি করে মাইকেলের চিন্তার মৌলি-কতায়। উপেক্ষিতা সূর্পণখা, দুঃশলা ও তারা চরিত্রকে মধুসূদন দিয়েছেন মানবিক মর্যাদা। চিরলাঞ্ছিতা এইসব চরিত্রকে আমরা দেখতে শিখলাম এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে, চিরাচরিত ভারতীয় নীতিবোধ এক দারুণ আঘাত পেল বিদ্রোহী মধুসূদনের হাতে, অথচ এই চরিত্র চিত্রণে মধুসূদন এমন মুন্সিয়ানা দেখালেন যে অতি নীতিবাগীশদের সমালোচনা মুখর কণ্ঠও স্তব্ধ হয়ে গেল।

ভিক্টোরীয় যুগের নীতিবাদ যা ব্রাহ্ম নীতি বাগীশতার পৃষ্ঠ-পোষকতায় ব্যক্তি মানুষের পক্ষে পদে পদে শৃঙ্খল পরাতে চাইলো তৎকালীন কোলকাতার বাবু কালচার প্রতিরোধী শক্তি হিসাবে। মাইকেলের মানবিক উদার ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী ও সাহিত্য ছিল এমনই অতি নীতিবাগীশতার বিরুদ্ধে জলন্ত প্রতিবাদ, অথচ তিনি কোনখানে সতিকারের সামাজিক অর্থনৈতিকতাকে প্রশ্রয় দেননি এবং এ সত্যের আমরা প্রমাণ পাই তার 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামক প্রহশন দুইটিতে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের পরম পূজারী হলেও তার সমাজ সচেতনতায় পরি-চিতি অল্প ছিলনা তাঁর এই সব রচনায়। মাইকেল নিজে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও, হিন্দু কলেজের সুযোগ্য ছাত্র হলেও এবং মদের প্রতি প্রচণ্ড আসক্তি সত্বেও তৎকালীন ইংরাজী শিক্ষিত ও

অর্ধশিক্ষিত বাবু সমাজের মদ্যাশক্তিও বিশৃঙ্খল জীবনের প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ অনীহা। তবে তার অনীহা ও অশ্রদ্ধা যত না ছিল এই সমাজের মানুষদের মদ্যাশক্তি ও অযৌক্তিক ভোগ সর্বস্ব জীবনের প্রতি তাঁর অনেক বেশী বিরাগ ছিল তাদের ভণ্ডামী ও মুখোসধারী জীবনের বিরুদ্ধে। তিনি চাইতেন অন্য মানুষেরাও সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমস্ত ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানাবে। একেই বলে কি সভ্যতা, প্রহসনে প্রধান চরিত্র নবকুমার আধুনিক অথচ ভীরু সাহসহীন তাই সে অনৈতিক। মদ্যপান তার কাছে ছিল একটা সামাজিক কুঅভ্যাস অথচ সে নিজেকে করে ফেলেছিল সেই কুঅভাসের দাস। সে তা অসামাজিক ও অন্যায় বলে মনে করতো বলেই এই দাসত্বের উপর একটা আবরণ দেওয়ার প্রয়াস পেত। এইখানেই দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের 'নিমচাঁদের' সঙ্গে নবকুমার চরিত্রের পার্থক্য। অবশ্য নবকুমার নিমচাঁদের মত খাঁটি বুদ্ধিজীবী সমাজের মানুষ ছিল না বলেই তার অভ্যাসকে কোন তত্ত্বের সহায়তার সমর্থন করতে সে অপারগ ছিল। তাছাড়া মধুসূদন এ চরিত্রের দৌর্বল্য যেভাবে অঙ্কিত করেছেন তাতে এ চরিত্রের পক্ষে কোন প্রকার সাহস বা তত্ত্বানুসন্ধানের পরিচয় দেওয়া বাস্তবানুগ হোত না।

পূর্বেই বলেছি, মাইকেল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের পূজারী হলেও তাঁর সমাজ সচেতনতার অভাব ছিল না, এবং এর পরিচিতি তাঁর উল্লিখিত প্রহসনে যেমন আমরা পেয়েছি, তেমনি পাই বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, নামক প্রহসনে। তথাকথিত ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ জমিদার সমাজপতির চারিত্রিক দৌর্বল্য কতখানি হাস্যকর পর্য্যায়ে পৌছতে পারে, তা হাল্কা চালেও হাল্কা ভাষায় মাইকেল বলে গেছেন এই প্রহসনে। তিনি চেয়েছিলেন এই সব ভক্ত প্রসাদদের নামাবলী সজোরে খুলে ফেলে তাদের আসল সত্ত্বাকে তুলে ধরতে অথচ এই কাজে তিনি কোন চাবুকের আঘাত দিয়ে

অথবা অতি উগ্রতার আশ্রয় নিয়ে শিল্পকে ক্ষুন্ন করেননি; হাস্যরসের যথার্থ আড়ালে এইসব মানুষের জীবনচর্য্যায় অসঙ্গতি ও বিকৃতি দেখিয়েছেন মুন্সিয়ানার দ্বারা। তাই আজও এই প্রহসন দু'খানি প্রত্নতাত্বিকের ঠাণ্ডা ঘরে না থেকে রসিক সমাজকে আনন্দ পরিবেশন করে চলেছে সাথে সাথে পাদপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোয়। যে সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের সঙ্গে সমাজ সচেতনতার সুষম মিলন ঘটে যে সাহিত্য কেবল সাময়িকভাবে রস পরিবেশন করে ক্ষান্ত থাকে না—যুগ বিশেষকে অতিক্রম করে অনেক দূর পরিক্রমা করে শাশ্বত হওয়ার সম্ভাবনা সবসময়ে দেখাতে না পারলেও, অনেক সময়েই দেখা যায় অনেক প্রহসন জাতীয় রচনাই যুগ বা কালকে অতিক্রম করতে পারে না কারণ এগুলি মূলতঃ যুগ বিশেষের দাবী নিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠে পাঠক সমাজের কাছে রসোত্তীর্ণতার দিকে লক্ষ্য না রেখেই। ফলে যুগ শেষ হয়ে যাওয়ায় পরে এগুলি নিছক ইতিহাস হয়ে পড়ে রসাবেদন হারায়। মধুসূদনের প্রহসন দুটি ইতিহাসকে অতিক্রম করেছে, কারণ মধুসূদন ছিলেন মূলতঃ শিল্পী। সমাজ সংস্কারক নন; সমাজ সচেতনতা সত্বেও; যে প্রহসন রচনার ধারা তিনি বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টি করলেন তা তার প্রায় সমসাময়িক দীনবন্ধু মিত্রের ও বিংশশতাব্দীর অমৃতলাল বসুর কালে পৌছে এক বিশিষ্ট রূপ পেল অথচ শেষোক্ত নাট্যকারের প্রহসন মাইকেলের প্রহসন দুটিকে অতিক্রম করতে পারলো না। রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে রয়েছে মাইকেলের সাহিত্যিক মহত্ব এবং এই মহত্বের উৎস লুকিয়ে রয়েছে মধুসূদনের মৌলিক শিল্প সত্বার মধ্যে যেখানে মিলন ঘটেছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সমাজসচেতনতার ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে মানবতাবাদী মানসিকতার।

মানবতাবাদী ঈশ্বরচন্দ্র

দেড়শত বৎসরেরও কিছু পূর্বে অর্থাৎ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব ঘটেছিল এমন এক সময়ে যখন নব্য বাঙলার তথা নব্য ভারতের অন্যতম স্রষ্টা রাজা রামমোহনের গৌরব সূর্য্য ভারতের মধ্য গগণে। ভারতবর্ষের যুগযুগান্তরের সঞ্চিত তমিস্রার বিরুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে এককভাবে সংগ্রাম করতে হয়েছিল ইতিহাসের এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালী পুরুষকে। যদিও প্রায় কিশোর প্রতিভাধর মনীষী ডিরোজিও রামমোহনের জীবনের শেষ পর্য্যায়ে তাঁর আরব্ধ কাজকে অনেকাংশে ত্বরান্বিত করেছিলেন যুক্তিবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে ও একদল নিষ্ঠাবান ও পরম সাহসী শিষ্যের সহায়তায়। ঈশ্বরচন্দ্র যখন রামমোহনের নব্য বাঙলা সৃষ্টির প্রয়াসকে সার্থক করতে আসরে আসীন হলেন তখন বাঙলার মধ্যবিত্ত যুবসমাজের একাংশ অনেকটা শিক্ষিত, ও গ্রহণ প্রবণ হয়ে উঠেছে। তবুও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এ সত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্রের দেশ গঠনের কাজ খুব সহজসাধ্য হয়ে দেখা দেয়নি, খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও। কুসংস্কার ও যুক্তি হীনতার যে জগদ্দল পাথর সহস্র বৎসরেরও বেশী ভারতবর্ষের জনমানসের উপর চেপে বসেছিল তা সহজে উত্তোলন করার ছিলনা। রক্ষণশীলতার শিকড় ব্যক্তি ও সমাজের প্রকৃতিতে এমনভাবে প্রোথিত থাকে যে, একক প্রয়াসে যা কয়েক বৎসরের মধ্যে তাকে মূলহীন করা যায় না। ইংরাজীতে একটা কথা আছে "Conservatism dies hard"—এই জন্যই যে রক্ষণশীলতা ও কুসংস্কারকে দূর করতে রাজা রামমোহন, ডিরোজিও ও ঈশ্বরচন্দ্র

সমগ্র জীবন সংগ্রাম করেছিলেন তার জট বোধহয় আজও সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করা যায়নি। তাই বিধবা বিবাহ আজও হিন্দু সমাজে সাধারণভাবে খুব একটা অভীপ্সিত বিষয় বলে বিবেচিত হয়না ও আইন করে বহুবিবাহ হিন্দু সমাজে নিষিদ্ধ করলেও ভারতে অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুবিবাহ আজও প্রচলিত—সতীদাহ আইনের দ্বারা বন্ধ করা হলেও গোঁড়া হিন্দু সমাজের অনেকে সতীদাহ প্রথার জয়গানে এখনও বিভোর—এর 'স্বর্গীয়' কীর্তনে এরা মুগ্ধ। তাই কেবল আইন করে এইসব কুসংস্কার লোপ করা যায়না—মানুষের মধ্যে যুক্তিপ্রবণতা জাগিয়ে এই মানবিকারকে দূর করতে হয়। সতীদাহ প্রথা নিবারণ আন্দোলনের ব্যাপারে রামমোহন এইভাবেই এগিয়ে গিয়েছিলেন—যদিও শেষপর্যন্ত তাঁকে আইনের সাহায্যই নিতে হয়েছিল। যুক্তিবাদী আন্দোলনকে সফল করে কুসংস্কারের জট সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করা যায়নি বলেই মাঝে মাঝে আইনকে আড়াল করে গোপনে সতীদাহ করা হয় পুণ্য অর্জনের জন্য, আর মোক্ষলাভের জন্য নরবলি দেওয়া হয় 'স্বপ্নাদেশের' বশবর্তী হয়ে বা 'গুরুমহারাজের' নির্দেশ অনুযায়ী। সামাজিক কাপালিকেরা সহজে মরেনা, যেমন মরেনা রক্ষণশীলরা।

ঈশ্বরচন্দ্র রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হলেও কেমন করে 'কালা পাহাড়' হয়ে উঠলেন, এ এক রহস্য—যেমন রহস্য রাজা রামমোহন রায়। কিন্তু এই রহস্য কিছুটা নিরসন করা যায় যদি আমরা এই দুই ঐতিহাসিক পুরুষের চরিত্রের মূলে প্রবেশ করতে পারি। পৃথিবীর অধিকাংশ সংস্কারকই মূলতঃ মানবতাবাদী। এই দুই পুরুষও এই সত্যের ব্যতিক্রম নন। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর—দুজনেই ছিলেন মানবপ্রেমিক। মানুষের প্রতি ভালবাসাই তাঁদের সমস্ত কাজের মূল প্রেরণা এবং তাঁদের এই মানবপ্রেম আবেগ সর্বস্ব বা নিছক হৃদয়ধর্মী নয়। কঠিন যুক্তিবাদের

উপর প্রতিষ্ঠিত এই মানবপ্রেম। দুজনেই ছিলেন যুক্তিবাদী মানবপ্রেমিক।

রামমোহন প্রদর্শিত যুক্তিবাদী পথে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর প্রবজ্যা সুরু করলেন তাঁর সুদৃঢ় পৌরুষ ও বজ্রকঠিন বহিরঙ্গ নিয়ে—অন্তরে মানবপ্রেমের সুধাবিন্দু বহন করে। জনৈক লেখক শিক্ষাব্রতী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে আশুতোষ ছিলেন বজ্রের চেয়ে কঠিন ও কুসুমের চেয়ে কোমল —তাঁর চরিত্র ছিলো নারিকেলের মত বাইরে কঠিন আবরণ অভ্যন্তরে সুমিষ্ট জল ও শাঁস। এই বিচারের মাপকাঠিতে ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন আশুতোষের যথার্থ পূর্বসূরী—চারিত্রিক ও শিক্ষা বিষয়ক চিন্তার সাদৃশ্যে।

প্রভাত দিনের প্রকৃতি নির্দেশক। এই প্রবাদের প্রতিফলন দেখা যায় ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রে। শৈশবে ও কৈশোরে যখন তিনি কোন সংকল্প নিতেন, তখন সেই সংকল্প থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করা সহজসাধ্য ছিলনা। চরিত্রের সমস্ত দৃঢ়তা, কাঠিন্য ও জেদ নিয়ে শির উঁচু করে তিনি দাঁড়াতেন তার সংকল্প অটুট রাখতে। তাঁর ভূয়োদর্শী ও ভবিষ্যদ্রষ্টা পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ মহাশয় 'এঁড়ে গরু' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন পৌত্র ঈশ্বরকে জন্মকালে তাঁর লক্ষণ দেখে—অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে নবজাতক এঁড়ে গরুর মতই জেদী হবে। তাঁর ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে উঠেছিল সংগ্রামী ঈশ্বরচন্দ্রের পরবর্তী জীবনে। এই জেদের জন্যই নিঃস্ব ব্রাহ্মণ ঠাকুরদাসের সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের মত তৎকালীন অভিজাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষা আদায় করে নিতে পেরেছিলেন। এই জেদকে পাথেয় করেই মানবতাবাদী ঈশ্বরচন্দ্র সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিধবা বিবাহ আইন পাশ করাতে সমর্থও হয়েছিলেন। এই একই ধরনের জেদী চরিত্র ছিল রাজা রামমোহনেরও। সতীদাহ প্রথা নিবারণে

তিনি একই প্রকারের জেদের পরিচয় দিয়েছিলেন। দেশে এই ব্যাপারে অসার্থক হয়ে বিলাতে পার্লামেণ্টে শেষপর্যন্ত সহমরণ আইন পাশ করাতে পেরেছিলেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে ঈশ্বরচন্দ্রের বিধবা বিবাহ আন্দোলন নিছক আবেগ প্রসূত প্রয়াস নয়। এ আন্দোলন নিছক আবেগ প্রসূত হলে শেষপর্যন্ত তাঁর পক্ষে দৃঢ়তা রক্ষা করা সম্ভব হোত না। কেবলমাত্র মায়ের অশ্রু বা তাঁর জোরালো সমর্থন তাঁকে এই আন্দোলনে ব্রতী করেনি। যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন বৈধব্যের যাঁতাকলে বাল্যবিধবাকে সারা জীবন নিষ্পেষিত রাখা সম্পূর্ণ মানবতা বিরোধী। মানবতাবাদ কখনো নিছক আবেগভিত্তিক হয় না—আবেগ কখনো কঠিন ভিৎ প্রস্তুত করতে পারে না। আবেগ পারে কেবল কর্মে প্রেরণা যোগাতে। আবেগের চরিত্র তাৎক্ষণিক বলে আবেগের জোয়ার ভাটা আছে। মানবতাবাদ আবেগভিত্তিক হলে শেষপর্যন্ত তা অসফল হবেই। কিন্তু মানবতাবাদ মূলতঃ একটি আদর্শবাদ এবং প্রতিটি আদর্শবাদের মূলে থাকে একটি যুক্তি। এই যুক্তিই আদর্শবাদকে চালিত করে। হয়ত কোন কোন আদর্শবাদীকে জীবনের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে আবেগ তাকে সহজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। কিন্তু আবেগকে আদর্শবাদের শক্ত মাটিতে দাঁড় করিয়ে ঘাতসহ কাঠামোর মধ্যে ভরে রাখতে হয়, নচেৎ এই আবেগ দাঁড়াবার কোন স্থান না পেয়ে অচিরেই যেকোন প্রতিকূল আবহাওয়ায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় জলের বুদ্বুদের মত—সেই সঙ্গে ব্যর্থতায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় আদর্শবাদীকেও।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের সমগ্র কর্মসূচী এই মানবতাবাদী আদর্শের শক্ত মাটিতে শেকড় গেথেছিল বলেই তাঁর প্রতি কাজ অধ্যাবসায়ের সাক্ষ্য দেয়। এদিক থেকে বিচার করলে তাঁর চরিত্র ছিল অবাঙালীচিত—অর্থাৎ বাঙালী চরিত্রের আবেগ সর্বস্বতা তাঁর চরিত্রের উপাদান হয়ে উঠেনি, যদিও অনেক সময়েই মানুষের

দারিদ্র্য ও দুঃখ মোচন করতে গিয়ে তিনি আবেগ চালিত হয়ে উঠতেন। চরিত্রের এই অবাঙালীত্বের জন্যই জনৈক মনীষী তাঁকে ইংরাজ চরিত্রের মানুষ বলে বর্ণনা করে গেছেন। ধুতি চাদর পরা এই মানুষটি মানসিক গঠনে সত্যই ছিলেন ইংরাজ। ইংরাজের শৃঙ্খলাবোধ, নির্ভীকতা, অধ্যাবসায় ও যুক্তিনিষ্ঠা বাঙালী পোষাক পরা এই মহান ব্যক্তিটির চারিত্রিক উপাদান ছিল। এই সত্যেরই আমরা অনুরণন শুনি যখন বিদ্যাসাগরের বর্ণনা দিতে গিয়ে মাইকেল মধুসূদন বলেন, বিদ্যাসাগর ছিল "The genious and wisdom of an ancient sage and energy of an english man"

বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদ একদিকে যেমন বুদ্ধিবাদের শক্ত মাটিতে ভিৎ খুঁজে পেয়েছিল, অন্যদিকে উৎস খুঁজে পেয়েছিল সাধারণ দুঃখী মানুষের জীবন যন্ত্রণায়। তাঁর বৈচিত্রময় সংগ্রামী জীবন সাধারণ মানুষের ব্যথা বেদনা গভীরভাবে অনুভব করে তাদের জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল—ফলে উৎসারিত হোল হৃদয়ে গভীর মানবপ্রেম। তাঁর গভীর দুঃখলাঞ্ছিত শৈশব ও কৈশোর, পারিবারিক অর্থকৃচ্ছ্রতা—পল্লী ও নগরের দুঃখী জনসাধারণের আর্থিক অসহায়তা ও নানা সামাজিক কুসংস্কার তাঁকে ব্যথিত করে তুললো। দৈনন্দিন জীবনযাপনের দৈন্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি ছিলেন আজন্ম শ্রেণীচ্যুত মানুষ। জোর করে বুদ্ধিমার্গী পথে নিজেকে শ্রেণীচ্যুত করতে হয়নি। তাঁর সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশই তাঁর আজন্ম শ্রেণীচ্যুতির অনুকূল ছিল। সাধারণ দুঃখী মানুষের সঙ্গে তাঁর ভাবকেন্দ্রিক একাত্মতা পরবর্তীকালে যুক্তির দ্বারা সমর্থিত হয়ে মানবতাবাদী আদর্শের ভিৎ শক্ত করে তোলে। ঈশ্বরচন্দ্রের ক্ষেত্রে হৃদয়মার্গের সঙ্গে বুদ্ধিমার্গের সংযোজন বাঙলার উনবিংশ শতাব্দীর মানবতাবাদের এক অভিনব বৈশিষ্ট্য। ঠিক এই বৈশিষ্ট্য আমরা রামমোহন

বা রবীন্দ্রনাথে লক্ষ্য করিনা, কারণ এই দুই মানবতাবাদীই ছিলেন মুখ্যতঃ অভিজাত শ্রেণীর মানুষ। উপরতলা থেকেই তাঁরা সাধারণ মানুষকে দেখেছিলেন—একই তলায় দাঁড়িয়ে তাঁদের এইসব দুঃখীদের পরিচয় নেওয়ার সুযোগ ঘটেনি। তাই তাঁদের মানবতাবাদ ছিল মূলতঃ বুদ্ধিমার্গীয়। একথা রবীন্দ্রনাথ নিজেও স্বীকার করে গেছেন তাঁর 'ঐক্যতান' কবিতায়। তিনি বলেছেন:

সমাজের উচ্চমঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে;
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিলনা একেবারে।

জীবনের এই অপূর্ণতা তিনি অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করে গেছেন। এইখানেই রয়েছে এক যথার্থ সৎ মানুষের পরিচিতি যা আজকের দিনে তথাকথিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত গণনীয়বাদের জীবনে কদাচিৎ দেখা যায়। যাইহোক, নীচের তলার মানুষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মেশার সুযোগ পাননি বলেই তাঁর মানবতাবাদ ছিল বুদ্ধিমার্গীয়। রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উপরোক্ত সত্যটুকু স্বীকারে দ্বিধা আসা উচিৎ নয়। এই সত্যের স্বীকৃতিতে রবীন্দ্রনাথের ভাবমূর্তি এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়না, উপরন্তু তাঁর আদর্শবাদের সঠিক ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ণ তাঁকে যথার্থ মূল্য দেবে।

ঈশ্বরচন্দ্রের মানবতাবাদের এই বৈশিষ্ট্য (পূর্বে আলোচিত) যদি ঊনবিংশশতাব্দীর অন্যান্য মানবতাবাদীদের মধ্যেও অঙ্কুরিত হোত, তাহলে বাঙলার নবজাগরণের ইতিহাস হোত অন্যরূপ। কোটি কোটি মূক ও অশিক্ষিত মানুষ খুঁজে পেতো তাদের যথার্থ নেতাকে, তাদের কাজের মানুষকে। এই কাজের মানুষেরা, জনসাধারণের নেতারা সংঘটিত করতে পারতেন দেশব্যাপী জ্ঞানবিপ্লব। ঘটতে পারতো যথার্থ নবজাগরণ। কিন্তু ঘটেনি—সম্ভব হয়নি বলেই বাঙলার তথাকথিত নবজাগরণ মধ্যবিত্ত সমাজের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত নগর মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

ফলে, উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের প্রকাশ বিংশশতাব্দীতে অনেকাংশে বিফল হল।

নবজাগরণের সঙ্গে মানবতাবাদ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মানবতাবাদী ব্যক্তিসত্বা সমষ্টি বা জাতির নবজাগরণের সহায়ক হয়। ব্যক্তি সত্বার স্বাধীনতার স্বীকৃতি, ব্যক্তি মানুষের প্রতি সহানুভূতি মানবতাবাদীর বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে মানবতাবাদীকে বিচার কোরতে হয়। স্বীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি আস্থা না থাকলে, নিজ সত্বাকে মর্য্যাদা দিতে না পারলে অপরের ব্যক্তি সত্বাকে ও অস্তিত্বকে সম্মান ও স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন অনন্যসাধারণ আত্মমর্যাদাজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষ। এই প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ তাঁর 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের আত্মমর্যাদাজ্ঞানকে Individuality বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বলে বর্ণনা করেছেন। ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অন্যতম মূল উপাদান হোল 'জেদ' যে সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যক্তিত্ব-শালী মানুষের ব্যক্তিত্ব তাঁর চরিত্রের Dynamism বা তীব্র বেগ ও প্রবল জীবনীশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং জেদের মাধ্যমে এই Dynamism প্রকাশ পায়। অবশ্য Dynamism-এর আর একটি বৈশিষ্ট হোল এই যে, যেব্যক্তি Dynamic যতক্ষণ তাঁর বিচারে কোন সত্য অভ্রান্ত বলে মনে হবে ততক্ষণ তিনি সেই সত্যের জন্য জীবন মরণ পণ করে সংগ্রাম করে যাবেন। কিন্তু যে মুহূর্তে সেই সত্য অভ্রান্ত বলে মনে হবেনা, সেই মুহূর্তে তিনি তা ছিন্নবস্ত্রের মত পরিত্যাগ করবেন এবং নতুন কোন সত্যের সন্ধানে ব্রতী হবেন। ব্যক্তিত্বশালী মানুষের চরিত্রে দ্বিধা ও অব্যবস্থিত চিত্ততা কদাচিৎ দেখা যায়। Dynamism তাঁদের এগিয়ে নিয়ে যায়, দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব চূর্ণিত হয়। বিদ্যাসাগরের চরিত্রে আমরা এই সত্যের পরিচয় পেয়েছি বারে বারে।

সমাজবাদীদের মতে সমাজ ও পরিবেশ ব্যক্তি চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে—অর্থাৎ ব্যক্তি মধ্যে সমাজ চরিত্র বা শ্রেণীচরিত্র প্রতিফলিত হয়—ইতিহাস শ্রেণী ও সমাজ চরিত্রের রূপান্তরের প্রতিবেদনমাত্র। অন্য কথায় ইতিহাস ব্যক্তি মানুষের গতি ও প্রকৃতির নিয়ন্তা। এইখানেই রয়েছে ঐতিহাসিক নির্দেশকবাদের মূল কথা। কিন্তু তাই কি সর্বাংশে সত্য? সাধারণভাবে একে স্বীকার করলেও, ইতিহাস সবসময়েই ব্যক্তিসত্তা নিয়ন্ত্রণ করেনা, সময়বিশেষে ব্যক্তি ও ইতিহাসের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে এবং যে ব্যক্তি ইতিহাসের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করেন তাঁকে আমরা বলি ঐতিহাসিক পুরুষ। তাঁদের সংখ্যা ইতিহাসে খুব নগণ্য নয়। এদেরই বলা যায় Dynamic personality—সাম্রাজ্য প্রথার প্রয়াসী বীর থেকে সমাজ ও ধর্ম সংস্কারক প্রভৃতি এই ঐতিহাসিক পুরুষের শ্রেণীতে পড়েন। এঁদের আবির্ভাব না ঘটলে সমাজের অন্তর্নিহিত বিশেষ বিশেষ ভাব-ফল্গু স্রোতকে বাধা মুক্ত করা সম্ভব হোত না বা হয় না। হয়ত তাঁরা সম্পূর্ণ নতুন কোন ধারা বা ভাবকে মুক্ত করেন না। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য্য যে তাঁদের আবির্ভাব না ঘটলে সমাজের তাগিদকে রূপ দেওয়া যেতনা বা যায়না। ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন এমনই একজন ব্যক্তিত্বশালী ঐতিহাসিক পুরুষ যিনি তৎকালীন সমাজের নিরুদ্ধ ভাবাবেগের ফল্গুধারাকে স্রোতস্বিনী করে তুললেন নিজের ব্যক্তিত্বের Dynamism এর দ্বারা। এরই অপর নাম Individuality এবং এই Individualityর পরিচয় ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিটি কর্মে ও ভাবনায়। এই Individualityর অস্তিত্ব প্রচণ্ডভাবে অনুভূত হয়েছে রাজা রামমোহনের চরিত্রে। ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ডতা একদিকে তাঁর জীবনে সংগ্রাম অনেক ক্ষেত্রে সার্থক করে তুলেছিল, কোন ক্ষেত্রে আবার এই প্রচণ্ডতা তাঁর সাফল্যের বিরুদ্ধেও কাজ করেছে। কারণ প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ অনেক সময়েই জীবনে সঙ্গীহীন হয়ে পড়েন—

এককভাবে জীবনে চলতে হয়, অন্যের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রয়োজনমত আপোষ করে চলতে পারেন না বলে। ঈশ্বরচন্দ্র সমস্ত জীবন ধরেই একরকম নিঃসঙ্গ ছিলেন। এই নিঃসঙ্গতা তাঁর জীবনে বড় করুণ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

বিধবা বিবাহ আন্দোলনের মত বড় আন্দোলনকে তিনি একক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন—এককভাবে সংগ্রাম করেছিলেন বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে। একে একে অনেক সঙ্গী, অনেক সমর্থক তাঁকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। আদর্শকে আঁকড়ে থাকার ক্ষমতা অনেকেরই ছিলনা। এই দুর্বিপাক কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। অনেক সময়েই প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বশালী মানুষকে এককভাবেই চলতে হয়, দুর্বিপাককে স্বীকার করে নিতে হয়। গান্ধিজীর শেষ জীবনে এই নিঃসঙ্গতার বেদনা এত বেশী তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল যে তিনি শতায়ু হওয়ার আশা ত্যাগ করে ছিলেন, তাঁর আদর্শের অপমৃত্যু দেখে। বিপ্লবী চিন্তানায়ক মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জীবনেও এই সত্য নির্মমভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বেই।

মানবতাবাদের যেমন অন্যতম উপাদান হোল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বা Individuality তেমন মানবতাবাদের আর এক উপাদান হোল যুক্তিবাদ। এই যুক্তিবাদের ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিটি চিন্তা ও কার্য্যের অন্তরালে ছিল অন্তঃশীল হয়ে। এই যুক্তিবাদী মানসিকতাই তাঁর দৃষ্টিকে লৌকিক পৃথিবীর দিকে নিবদ্ধ রেখেছিল। নৈতিক মানবতাবাদী হিসাবে এটাই ছিল তার পক্ষে স্বাভাবিক। বৈদান্তিক ভারতকে সর্বপ্রথমে পার্থিব পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছিলেন যুক্তিবাদী রাজা রামমোহন নবজাগরণের জনক হিসাবে। ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন সেই একই পথের পথিক। যদিও বেদান্তের ভাষ্য নিয়ে তিনি নিজেকে বিব্রত করে তোলেননি, লৌকিক সমস্যাকে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তিনি সরাসরি বিচার করতে চেয়েছিলেন এবং তার সমাধান

খুঁজেছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আমরা পাই তাঁর অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসাতেও। যুক্তিবাদী হিসাবে তিনি জিজ্ঞাসা রেখেছিলেন গৃহীত সত্যের (Hypothesis) মূল দেশে। অনুসন্ধিৎসা (Spirit of enquiry), প্রতিটি গৃহীত সত্যের মূল তত্ত্বই যাচাই করার প্রচেষ্টা মানবতাবাদী ব্যক্তি মানুষের আর একটি বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি ঘটনার কার্যকারণকে তিনি এই অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করতে চাইতেন তাই কোন ঘটনা বা ট্রাজেডিকে নিছক ঈশ্বরের লীলা বা তাঁর দুর্বোধ্য অভিরুচির ফলশ্রুতি বলে গ্রহণ করতে পারতেন না। কার্য্যকারণ খতিয়ে দেখতে গিয়ে তাঁর যুক্তিবাদী মন এই লীলা মাহাত্ম্যের আশ্রয় খুঁজে পেতনা। তাঁর মনে দেখা দিত সংশয় ও দ্বিধা। জিজ্ঞাসা জাগতো ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে। স্যার জন লরেন্স নামে বাষ্পীয় জলযানটি সাগরে ডুবে যাওয়ার ফলে যখন শত শত লোকের প্রাণহানি ঘটলো, তখন ঈশ্বরচন্দ্র বলেছিলেন "দুনিয়ার মালিক কি আমাদের চেয়ে নিষ্ঠুর যে নানা দেশের লোককে একত্রে ডুবাইলেন ? আমি যাহা পারিনা, তিনি পরম কারুণিক মঙ্গলময় হইয়া কেমন করিয়া এই ৭০০/৮০০ লোককে ডুবাইয়া ঘরে ঘরে শোকের আগুন জ্বালাইয়া দিলেন ? দুনিয়ার মালিকের কি এই কাজ ? এই সকল দেখিলে কেহ মালিক আছেন বলিয়া বোধ হয় না।" যুক্তি দিয়ে তিনি এই দুর্ঘটনার কারণ খুঁজে পাননি, ঈশ্বরের লীলা বলেও একে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর মনে জেগেছিল সংশয়। যুক্তিবাদী মানুষ এইভাবে ঘটনার কার্য্যকারণ বিশ্লেষণ করে থাকেন। এই যুক্তিবাদই ঈশ্বরচন্দ্রের আধ্যাত্মিক জীবনে সংশয়ের ছায়া ফেলেছিল। এদিক থেকে বিচার করলে ঈশ্বরচন্দ্রের যুক্তিবাদ রামমোহনের যুক্তিবাদ অপেক্ষাও তীব্রতর ও অধিকতর বাস্তবমুখীন। জীবনকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন জীবনের কোন দার্শনিক ব্যাখ্যা ব্যাতিরেকেই, কট্টর বাস্তববাদী হিসাবে। আধ্যাত্মিক ভারতে

ঈশ্বরচন্দ্র একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। কোন কোন সমালোচক বিদ্যাসাগর যে সংশয়বাদী ছিলেননা একথা প্রমাণ করার জন্য উল্লেখ করেছেন যে বিদ্যাসাগরের পত্রাদিতে 'শ্রীহরিশরণম' শব্দ দুটি দেখা যায় এবং এই উল্লেখই নাকি তাঁদের মতে প্রমাণ করে যে তিনি ধর্ম বিশ্বাসী ছিলেন—ঈশ্বরে আস্থাশীল ছিলেন। কিন্তু পত্রে নিছক এই শব্দ দুটির অস্তিত্ব ঈশ্বরচন্দ্রের যথার্থ মানসিক প্রবণতার পরিচয় দিতে পারে না। তাই যদি দিত তাহলে এলাহাবাদের ত্রিবেণী সঙ্গমে কুম্ভমেলার সময় জহরলাল নেহেরু কর্তৃক স্বীয় মস্তকে জল সিঞ্চন তাঁর হিন্দুত্বের পরম নিদর্শন বলে বিবেচিত হোত। কিন্তু কোন আধুনিক শিক্ষিত মানুষ জহরলাল সম্বন্ধে সে ধারণা পোষণ করবেন না বলেই মনে হয়। অনেক সময়ে মানুষ কতগুলো আচার পালন করে নিতান্তই অভ্যাসের বশে। যেমন অনেক আধুনিক শিক্ষিত ভারতীয় মেয়ে স্ত্রী-আচার পালন করেন হিন্দু সমাজে দশকর্মাদি অনুষ্ঠানের সময়ে। সমাজতত্ত্ব আলোচনা করলে দেখাযায় যে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন সময়ে নানা আচার ও আচরণের সূত্রপাত ঘটে বিভিন্ন কারণে। কিন্তু কালের গতিতে ওইসব আচার পালনের মূল কারণগুলি দূরীভূত হলেও ওই আচার ও আচরণগুলি দৈনন্দিন জীবনে অনড় হয়ে বসে থাকে অকেজো যন্ত্রের মত। এ এক ধরনের সমাজতাত্ত্বিক Anachronism এবং এর দ্বারা ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠি বিশেষের মানসিকতার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না তাই ঈশ্বরচন্দ্রের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিশ্লেষণ করতে গেলে এই সত্যকে মনে রাখা প্রয়োজন।

ঈশ্বরচন্দ্রের যুক্তিবাদী ও বাস্তববাদী মানসিক গঠনের আর একটি পরিচয় আমরা পাই রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সঙ্গে তাঁর আলাপ আচরণে। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, যে যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের মত উচ্চশিক্ষিত, পরিশীলিত ও

বুদ্ধিমার্গীয় মানুষ, মাইকেলের মত পাশ্চাত্য শিক্ষিত মানবতাবাদী মহাকবি, কেশবচন্দ্রের মত ধর্ম সংস্কারক, ডঃ মহেন্দ্রনাথ সরকারের মত প্রথিতযশা চিকিৎসা বিজ্ঞানী পরমহংসদেবের ভাবশিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন বিনা দ্বিধায় সেই যুগে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশের সন্তান হয়েও ঈশ্বরচন্দ্র গুরুবাদী মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেননি, দক্ষিণেশ্বরের ঈশ্বরোবাদ ব্রাহ্মণ পরমহংসের পায়ে লুটিয়ে পড়েননি মুক্তির আশ্বাস পাওয়ার আশায়। বরঞ্চ পরমহংসদেবই চলে এসেছিলেন 'বিদ্যার সাগরের' কাছে, বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিলেন এই বিরাট ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে। অবশ্য এখানে বলা প্রাসঙ্গিক হবে যে পরমহংসদেবের ঈশ্বরচন্দ্র সন্দর্শনের প্রয়াসের মধ্যে স্বকীয় তাঁর মহৎ মনের, নিরাভিমান চিত্তের পরিচিতি রয়েছে। গুরুবাদী দেশে বিদ্যাসাগরের উল্লিখিত আচরণ একটি ব্যতিক্রম জাতীয় উদাহরণ। উনবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে এদিক থেকে তিনি একক ও অনন্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এ আর এক অভিনব প্রকাশ।

আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মনৈতিকতা অধ্যুষিত ভারতবর্ষে সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ ঈশ্বরচন্দ্রের এই আচরণ নিশ্চয়ই বিস্ময়কর। কিন্তু অন্যায়ানুগত (illogical) নয়, কারণ ঈশ্বরচন্দ্রের মানসিকতায় যে যুক্তিবাদ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল তা যে তাঁর মনকে বস্তুমুখীন করে তুলবে তা ত স্বাভাবিকই। জড়বাদী মানুষ প্রতিটি ঘটনার কার্য্যকারণ অনুসন্ধান করে—কোন তত্ত্ব বা তথ্যকে বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ করেনা। জড়বাদের ধর্মই হোল যে কোন গৃহীত সত্যের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানানো—সংশয় প্রকাশ করা। ঈশ্বরচন্দ্র বস্তুতঃ জড়বাদী ছিলেন বলেই হয়ত তিনি সংশয়ী ছিলেন পরমহংসদেবের অবতারত্ব সম্বন্ধে এবং অনেকের মত ছুটে যাননি দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিনীর মন্দিরে রামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্য লাভ প্রয়াসে, যদিও তিনি মহৎ ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে পেছুপা

ছিলেন না এবং এর প্রমাণ দেখা যায় পরমহংসদেবকে নিজ আলয়ে যথাযথভাবে অভ্যর্থনা জানানোর মাধ্যমে।

প্রসঙ্গত আর একটি কথা বলা প্রয়োজন ঈশ্বরচন্দ্রের মনের গঠন সম্বন্ধে। কোন এক লেখক এক জায়গায় লিখেছেন "তিনি (ঈশ্বরচন্দ্র) কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বসিয়া কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে অখিলউদ্দিন নামে এক অন্ধ ও খঞ্জ ফকির একটি গান করিতে করিতে যাইতেছিল। গানের প্রথম চরণ—'কোথাও ভুলে রয়েছ ও নিরঞ্জন' শুনিবামাত্র তিনি তাঁহাকে ডাকাইলেন।........ ওই গানটি আদ্যপান্ত পুনঃ পুনঃ প্রাণ ভরিয়া শুনিলেন। যতক্ষণ গান শুনিয়াছেন ততক্ষণ অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জন করিয়াছেন। .... অনেকক্ষণ নীরবে সঙ্গীতজাতভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া রহিলেন।" এই লেখকের মতে এই ঘটনাটির মধ্যে ঈশ্বরন্দ্রের ধর্মবিশ্বাসের পরিচিতি রয়েছে। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাটি কি সত্যই ঈশ্বর বিশ্বাসের দিগ্‌নির্ণয়ক? একথা বলা বাহুল্য যে বিশ্বের যে কোন কবিতা বা গান, ভাব ঐশ্বর্য্যে ও সুর মাধুর্য্যে সমৃদ্ধ থাকলে অনেকসময়েই গ্রহণশীল বা গ্রহিষ্ণু শ্রোতাকে ধর্মমত নির্বিশেষে সাময়িকভাবে ভাববিহ্বল করে তোলে—যথার্থ শিল্পরসের এমনই প্রভাব। কিন্তু এই ভাববিহ্বলতা সব সময়ে পাঠক বা শ্রোতার মানসিক গঠন, তার বিশেষ কোন আদর্শের বা বিশ্বাসের পরিচয় দেয় না। সুধী পাঠকের হয়ত জানা আছে যে রবীন্দ্রনাথের পরম শুভার্থী প্রিয়নাথ সেন ছিলেন একজন উঁচু-দরের কাব্যরস ও সঙ্গীত সমঝদার। রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়েই প্রিয়নাথবাবুকে স্বরচিত গান ও কবিতা না শুনিয়ে তৃপ্তি পেতেন না। প্রিয়নাথ অনেকসময়েই এই গান ও কবিতা শুনে বিশেষ অভিভূত হয়ে যেতেন—অশ্রু বিসর্জন করতেন, ভাব সমৃদ্ধ ঈশ্বর বিষয়ক গান ও কবিতা শুনে, অথচ তিনি ছিলেন ঘোরতর সংশয়-বাদী (Agnostic) ভাববিহ্বলতা বা Emotion মনের একটি

তাৎক্ষণিক অবস্থা মাত্র। কাজেই এই অবস্থার উপর গুরুত্ব দিয়ে ব্যক্তি বিশেষের প্রবণতা ও মৌলিক ধারণার প্রকৃত বিচার করা চলেনা। বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে বা সেগুলি একত্রে গণনা করে একটি সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়া যায়না এবং তা ন্যায়শাস্ত্র অনুমোদিতও নয়। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে এইধরনের ইতস্ততঃ ঘটনার প্রক্ষেপের অভাব নেই। এইসব ঘটনার প্রকৃতি বিচার করতে গেলে সেইসব ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা বিচার করা প্রয়োজন—নচেৎ বিচারে ভুল থেকে যাবে। উল্লিখিত ঘটনা কয়েকটি থেকে ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বর বিশ্বাস প্রামাণ্য সত্য বলে প্রতীয়মান হবে না। বরঞ্চ জাহাজডুবির ফলে অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর ঘটনায় ঈশ্বরচন্দ্রের মানসিক প্রতিক্রিয়া তাঁর সংশয়বাদী মনেরই পরিচয় দেবে। বারাণসীতে শিব-অন্নপূর্ণা দর্শনের ও ওই দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে শেষ মুহূর্তে তাঁর পূজা দেওয়ার অভিপ্রায় ত্যাগ করার মধ্যে আমরা সংশয়বাদী ঈশ্বরচন্দ্রকে আরো বেশী উজ্জ্বলতর দেখি। কাজেই ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবমূর্তিকে ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী ও আরো মনোহারী করে তোলার জন্য তাঁকে ঈশ্বর বিশ্বাসী ও ঈশ্বরপ্রেমিক বলে প্রতিভাত করার প্রয়োজন কি যদি আমরা তাঁর মধ্যে একটি খাঁটি মানবতাবাদীকে আবিষ্কার করতে পারি? মধ্যযুগের ইউরোপের মানবতাবাদীদের মধ্যে কে কতটা ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন তা নিয়ে আমরা মস্তিষ্ক কুন্ডয়ন করিনা, আমরা তাঁদের বিচার করি তাঁরা সভ্যতার প্রগতিতে কতটা অবদান রেখে গেছেন, এই তথ্য যাচাই করে। ঈশ্বর বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়—তা ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির সম্পর্ক নির্ণয়ের মাপকাঠি বলে বিবেচিত হতে পারে না। মানবপ্রেমই হল এই সম্পর্ক নির্ণয়ের যথার্থ মান নির্ধারক এবং এই পরিপ্রেক্ষিতেই মানবতাবাদীর মূল্য নির্ধারণ প্রয়োজন। বিদ্যাসাগরের ধ্রুপদী সমালোচকেরা—এদিক থেকে তাঁকে বিচার করেন নি বা করতে চাননি। যেকোন বিচারেই

নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় রাখা আবশ্যক। বিচারকের যদি তার পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে উত্তরণ না ঘটে তাহলে সে বিচারকের বিচার ভ্রান্ত বা পক্ষপাতপুষ্ট হতে পারে। মাইকেল মধুসূদন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি এক জায়গায় বলেছিলাম যে জনৈক ভারত-প্রবাসী ইউরোপীয় ধর্মযাজকের মতে মধুসূদন খ্রীষ্টপ্রেমে আপ্লুত হয়ে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন—অর্থাৎ জাগতিক কোন কারণ বা প্রলোভন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে মাইকেলকে প্রলুব্ধ করেনি—এই উক্তি সত্য বিকৃতির একটি বড় রকমের উদাহরণ। যাজক মহাশয় স্বীয় ধর্মনৈতিক আনুগত্য ও পরিবেশের প্রভাবকে এড়াতে পারেননি বলে মাইকেলের উপর এই মন্তব্য রেখেছেন। বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক কোন কোন সমালোচক ও বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরেও কেউ কেউ এ একই প্রবণতা দেখিয়েছেন তাঁকে বিচার করার সময়ে। এই ধরণের বিচার প্রবণতার পশ্চাতে রয়েছে সমালোচকের ভাববাদী (Idealistic) দৃষ্টিকোণ। ভাববাদী দৃষ্টিকোণ সম্পন্ন মানুষের মধ্যে সাধারণতঃ দেখা যায় গৃহীত সত্যকে (Hypothesis) নির্বিচারের স্বীকার করার একটা মানসিকতা, ফলে অতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা রঞ্জিত করে তোলে সমালোচকের বিচারবোধকে। বিচার নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হলে, সমালোচককে মানবতাবাদী মানুষকে বিচার করতে হবে জড়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে, এবং নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে। সমালোচক শ্রীবিনয় ঘোষ সর্বপ্রথম এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্যাসাগরের মূল্যায়ণ করতে এগিয়ে এসেছেন তাঁর 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী' সমাজ গ্রন্থে। এই জড়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বোঝা যায় একজন মানবতাবাদীর মানবতাবাদ কতখানি নির্ভেজাল ও বাস্তবসম্মত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ণ করলে দেখা যাবে বিদ্যাসাগরই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পূর্ণ মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব যিনি ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় না নিয়ে ব্যক্তি ও সমাজকে কল্যাণের পথ বেছে নিতে সহায়তা করেছিলেন।

কল্যাণের পথ নির্দেশ করতে তিনি কেবলমাত্র ধর্মনৈতিকতাকে পাশে সরিয়ে রাখেন নি অবাস্তব ভাবপ্রবণতাকেও আমল দেননি। বিদ্যাসাগর যে সময়ে ইংরাজী শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের আন্দোলনে সমর্পিত প্রাণ, সেইসময়ে সিপাহী বিদ্রোহ সমগ্র ভারতবর্ষে একটা বিরাট তুফান তুলেছিল, সেই তুফানে ভেসে গিয়েছিল দেশীয় সেনা ও সেনানী, অভিজাত মানুষ ও দেশীয় অনেক সামন্ত নৃপতিদের সঙ্গে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বড় একটা অংশ। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে নীরব ছিলেন। আর এই নীরবতাই আজকের দিনে অনেক উগ্রপন্থী ও তথাকথিত কোন কোন রাজনীতি ব্যবসায়ীকে প্রবুদ্ধ করেছে—বিদ্যাসাগরকে প্রতিক্রিয়াশীল ও ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থক হিসাবে ঘোষণা করতে। ইতিহাসের কি অপরূপ অপব্যাখ্যা। পৃথিবী অভিজ্ঞ ও বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন যে এই বিদ্রোহ প্রতিক্রিয়াশীল—এই বিদ্রোহ সার্থক হলে ভারতবর্ষে নবজাগরণের প্রয়াস আবার অনেক বৎসর পেছিয়ে যাবে—মধ্যযুগীয় তমিস্রায় আবার ঢাকা পড়বে সমগ্র ভারতভূমি। ইংরাজ শাসন যতই অবাঞ্ছিত হোক, যতই থাকুন না কেন দেশ শাসনের মূলে শোষকের শোষণ স্পৃহা, ইচ্ছায় হোক অথবা প্রয়োজনের তাগিদে হোক, ইংরাজ শাসকদের ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানে সুবিধা ভারতবাসীকে দিতে হয়েছে—যার ফলে ভারতবাসী একদিন বিশ্বসভায় স্বীয় আসন আবার কায়েমী করে নেবে। কিন্তু এই সম্ভাবনাকে ধূলিস্যাৎ করে দেবে ক্ষুব্ধ নৃপতি ও অভিজাতবৃন্দ চালিত এই যুদ্ধ যদি সাফল্যমণ্ডিত হয়। বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন সিপাহীদের এই যুদ্ধ নিতান্তই শ্রেণীগত ও শ্রেণীস্বার্থবাহক বিদ্রোহ (Rebellion), যথার্থ বিপ্লব নয়। যথার্থ বিপ্লবের পেছনে থাকে একটা সামগ্রিক জাগরণ যে জাগরণের পরিচয় আমরা পেয়েছি ফরাসী বিপ্লবের পটভূমিকায়, যে জাগরণ আমরা দেখেছি রাশিয়ায় বলশেভিক

বিপ্লব সংঘটনের পূর্বে। গণজাগরণের কোন চিহ্ন নিদর্শন ছিলনা সিপাহী বিদ্রোহের পশ্চাৎভূমিতে। ঈশ্বরচন্দ্র মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন এই সত্য। তাই তিনি ছিলেন নীরব। সমর্থন বা সমালোচনা, কিছুই বহির্গত হয়নি তাঁর লেখনী থেকে।

উল্লিখিত উদাহরণ থেকে প্রতীয়মান হবে যে মিথ্যা (Pseudo) স্বদেশপ্রেম বা অবাস্তব রাজনৈতিক বুদ্ধি তাঁর বিবেককে নিঃসাড় করে দিতে পারেনি। তাই, তিনি ইংরাজ দেশ থেকে চলে যাক, বিতাড়িত হোক ভারতভূমি থেকে, এই আওয়াজ তুলে তিনি সস্তা করতালি পাওয়ার চেষ্টা করেননি। এই আওয়াজ তুললে হয়ত তিনি বাহবা পেতেন। আজকের উগ্রপন্থীরা তাঁর বিরূপ সমালোচনায় মুখর হোতনা, কিন্তু তা ঘটলে আমরা মানবতাবাদী ঈশ্বরচন্দ্রকে পেতাম না— হারাতাম শিক্ষা সংস্কারক বিদ্যাসাগরকে। এদিক থেকে বিচার করলে তিনি ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের যথার্থ উত্তরসূরী। রামমোহন ভূমি সংস্কার আন্দোলন, ইংরাজ নীলকরদের ভারতে পাকাপাকিভাবে বাস করানোর প্রয়াস তাঁর দুরদর্শিতারই পরিচায়ক ছিল সেই সময়কার রাজনৈতিক পটভূমিকায়, আজিকার কোন কোন ভারতবাসীর দৃষ্টিতে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল বলে প্রতিভাত হলেও। অসাধারণ পুরুষেরা যুগের আগে চিন্তা করেন, ভবিষ্যতের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে কাজ করে যান। কিন্তু তাঁদের এই চিন্তার কদর্থই করা হয়—তা প্রশংসিত হয়না সাধারণ ভাবে। সক্রেটিস, গ্যালেলিও প্রভৃতি মনীষীদের জীবন এই কথাই বলে। যুগোত্তরচিন্তা ও ভাবনা অনেক ক্ষেত্রেই চিন্তানায়কদের জীবন শোকাবহ করে তোলে। বিদ্যাসাগরের জীবনে নিঃসঙ্গতা ও কারুণ্য এই সত্যের স্বপক্ষে রায় দেয়।

আর একটা কথা, বিদ্যাসাগরের স্বদেশপ্রেম ছিলনা, ছিলনা জাতীয়তাবোধ, কারণ সিপাহী বিদ্রোহ সমর্থন করেননি— এই উক্তি বা অনুমান কতখানি মিথ্যা তা প্রমাণ করবে তাঁর স্বকীয়

জীবন ও জীবন বেদ। সংস্কৃত কলেজের ও ইংরাজের অধীনে শিক্ষা বিভাগে উচ্চপদ তিনি অবহেলায় ত্যাগ করেছিলেন, যখনই বুঝেছিলেন যে এই চাকরী কেবল তাঁর আত্মসম্মানের পরিপন্থী নয়, এ চাকরী তাঁর আরব্ধ কার্য্য,—শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসকে ব্যাহত করবে। দেশে ও দেশের মানুষের প্রতি কতখানি মমত্ববোধ থাকলে অর্থ ও প্রতিপত্তি তিনি বিনা দ্বিধায় ছিন্নবস্ত্রের মত পরিত্যাগ করতে পারেন। তাঁর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর স্বদেশপ্রেমের বিরোধ ছিলনা। তাঁর স্বদেশপ্রেম সংকীর্ণ ছিলনা বলেই, সস্তা বাহবা পাওয়ার প্রত্যাশী তিনি কোনদিনই ছিলেন না। তাঁর স্বদেশপ্রেম ও মানবতাবাদ ছিল পরস্পরের পরিপূরক এবং তার অন্যতম প্রমাণ দরিদ্র ও গুণগ্রাহী সাঁওতালের কাছ থেকে সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হয়ে শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ নিষিদ্ধ মোরগ গ্রহণ। মানুষকে কতখানি ভালবাসতে পারলে এমনভাবে সামাজিক সবরকম বাধানিষেধ (Teboos) ও সংস্কারের উপরে উঠা যায়। অবশ্য এ বাধানিষেধ অগ্রাহ্য করার পেছনে কেবল হৃদয় নয়, তাঁর এইসব আচরণ নিছক ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাসের প্রকাশমাত্র ছিলনা।

কেবলমাত্র সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে নয়, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি সম্পর্ক স্থাপনে নয়, জীবনে ধ্যানধারণার প্রকাশে নয়, শিক্ষার জগতেও ঈশ্বরচন্দ্র বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বিষয় পরীক্ষা করেছেন। তিনি বুঝেছিলেন পাশ্চাত্য দর্শনে ও জ্ঞান বিজ্ঞানে ভারতবাসীকে শিক্ষিত করতে না পারলে আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে তাদের তাল রাখা সম্ভব হবেনা, প্রগতির পথ রুদ্ধ থেকে যাবে। এই জন্য তিনি পাঠক্রমে ভারতীয় ভাববাদী দর্শনের পঠনপাঠনের উপর জোর না দিয়ে পাশ্চাত্যে দর্শনের পাঠের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে খাঁটি মানবতাবাদী হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য ও দর্শন চর্চাকে

একেবারে নস্যাৎ করে দেননি। এদিক থেকে তিনি রামমোহনের মতই ছিলেন সমন্বয়বাদী, যদিও মনের গঠনে তিনি ছিলেন আরো বেশী বৈপ্লবিক ও আমূল পরিবর্তনকারী। ইউরোপের মধ্যযুগীয় মানবতাবাদীরা ইউরোপের ধ্রুপদী শিক্ষাকে করায়ত্ত করে, তার নবমূল্যায়ণ ঘটিয়ে তৎকালীন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছিলেন—তার ফলে ঘটেছিল ইউরোপে নবজাগরণ। রামমোহনের মত বিদ্যাসাগরেরও ভারতীয় ধ্রুপদী শাস্ত্রে, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে মর্মে মর্মে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন ফলে তাঁর জীবনে এসেছিল একটি সমন্বয়ধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী যা আমরা মানবতাবাদীর ক্ষেত্রে প্রত্যাশা করি। সাংখ্য, বেদান্ত ও অন্যান্য ভাববাদী দর্শনে তাঁর অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল, কিন্তু এগুলিকে তিনি সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। অথচ বুদ্ধিচর্চার খাতিরে এগুলির পঠন পাঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করেননি। এইখানেই রয়েছে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর নতুনত্ব।

তিনি বুঝেছিলেন যে এই ভাববাদী দর্শনের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপন শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে পারবেনা—বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এর প্রয়োজনীয়তাকে যাচাই করতে হবে, পাশ্চাত্য দর্শনকে এর পাশাপাশি রেখে। এদিক থেকে তিনি রামমোহনের উত্তরসূরীর কাজ করেছিলেন। রামমোহন বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই দর্শনের মায়াবাদী ভাষ্য পরিহার করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে মায়াবাদের উপর গুরুত্ব দিলে ভারতবর্ষের জাগতিক সমৃদ্ধি ঘটবেনা কোনদিনই। তাই দেখা যায় বেদান্তের নব ভাষ্য রচনায় রামমোহনের বস্তুবাদী মনই অধিকতর সক্রিয় হয়েছিল। ঠিক এমনই একটি মন কাজ করেছিল বিদ্যাসাগরের জীবনে শিক্ষার পঠনক্রম প্রস্তুতকালে। কাজেই দেখা যায় যে শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর ভারতীয়

ধ্রুপদী শিক্ষার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয় ঘটিয়ে তৎকালীন বাঙালী মানসকে জাগ্রত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, এবং এই সমন্বয়ধর্মী নবশিক্ষার ধারাকে সমাজের প্রতিটি স্তরে বহমান করার জন্য তিনি জোর দিয়েছিলেন মাতৃভাষাকে শিক্ষার যোগ্য ও যথার্থ বাহন করে তুলতে। অন্যদিকে এই বাহন করার উদ্দেশ্যেই তিনি চাইলেন বাংলা গদ্যকে ঢেলে সাজাতে। ফলে গদ্য সাহিত্যে ঘটলো অভূতপূর্ব পরিবর্তন। তাই প্রাক্ রামমোহন গদ্য সাহিত্যের সঙ্গে বিদ্যাসাগরীয় গদ্য ভাষায় লক্ষ্যনীয় বিভিন্নতা। মাতৃভাষার মাধ্যমে ব্যতীত সমাজ মানসকে যথার্থ জাগ্রত করা যায়না, যায়না তাকে শিক্ষিত করা—কুসংস্কার মুক্ত করা। একের পর এক তিনি সৃষ্টি করে চললেন—লিখলেন :—বোধদয়, অভিজ্ঞান শকুন্তলা প্রণয়ণ করলেন বিধবা বিবাহ বিষয়ক পুস্তক, বর্ণপরিচয়, প্রথমভাগ ও দ্বিতীয়ভাগ (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ), সীতার বনবাস (১৮৬২ খৃষ্টাব্দ) ব্যাকরণ কৌমুদী ও আখ্যান মঞ্জরী (১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ) এবং সেক্স-পীয়রের কমেডি অব্ এররস অবলম্বনে 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৭০ খৃষ্টাব্দে)। ইহা ব্যতীত জনমতকে সুসংহত করার জন্য বিধবা বিবাহ নিরোধ করার প্রয়াসে বহু পুস্তক ও পুস্তিকা রচনা করেন। সর্বসাকুল্যে তিনি ৫২খানা গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রণয়ণও প্রকাশ করেন শিক্ষাব্রতী ও সংস্কারক হিসাবে।

কেবল গ্রন্থ রচয়িতা হিসাবে নয়, সাংবাদিক হিসাবেও জন-মতকে শিক্ষিত করার জন্য তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁরই পরিচালনায় প্রকাশিত হয় 'সোম প্রকাশ', সহায়তা করেন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা সম্পাদনায়। উনবিংশ শতাব্দীর জনমানসকে জাগ্রত করার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেন জীবনের শেষদিক পর্যন্ত। মানবতাবাদী হিসাবে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে গণচেতনাকে সুগঠিত ও জাগ্রত করতে হলে মাতৃভাষাকে মাধ্যম করা একান্ত প্রয়োজন। প্রোটেষ্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের জনক মার্টিন

লুথার মধ্যযুগীয় নবজাগরণের প্রাক্‌কালে ঠিক এই ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন—ল্যাটিন ভাষার পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে ধর্মমত প্রচার করেন—পুস্তিকা ও রচনা করেন আঞ্চলিক ভাষায়, যাতে খ্রীষ্টধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব আপামর জনসাধারণ সহজে ও স্বাধীনভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে অন্যের সহায়তা ব্যতিরেকেই। ফলে ল্যাটিন জানা ধর্মযাজককের করায়ত্ত রইলনা 'স্বর্গের চাবিকাঠি'। যাজক সম্প্রদাদের স্বার্থ সৌধ ভেঙে পড়তে সুরু করল লুথারের বৈপ্লবিক প্রচার পদ্ধতির আঘাতে। মধ্যযুগে নবজাগরণের প্রাক্‌কালে কেবল লুথার নয়, তার পরেও অনেক মানবতাবাদী মনীষী ও সংস্কারক আঞ্চলিক ভাষার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন জনমতকে শিক্ষিত করার জন্য, এবং এই প্রয়াসের ফলে ইউরোপের নবজাগরণ একটি সামগ্রিক রূপ লাভ করে, নবজাগরণের ফলশ্রুতি সমাজের শেষপর্যন্ত পৌঁছায়, কেবলমাত্র উপরতলার সীমাবদ্ধ না থেকে এবং এরই ফলে ইউরোপ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষপর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু এমনটি হয়নি বাঙলা তথা ভারতবর্ষে। সে আলোচনা এখানে থাক। ঈশ্বরচন্দ্রের মতই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষাকে মাধ্যমে হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, কেবল ব্যবহারিক জীবনে নয়, ধর্মনৈতিক জীবনেও। ব্রাহ্ম সমাজের ধর্মসভায় বাংলা ভাষায় প্রার্থনা পরিচালনার সূত্রপাত হোল দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায়, এমনকি শ্রাদ্ধ ও বিবাহাদির মন্ত্র ও বাংলা ভাষায় লিখিত ও ব্যবহৃত হল সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে। বিবাহ-মন্ত্র ও প্রার্থনার ভাষা সংস্কৃতজ্ঞদের একচেটিয়া হয়ে রইলো না। এগুলির ঘটলো সাধারণীকরণ—জনসাধারণ অধিকতর শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পেল। কিন্তু এই ব্যবহার শহরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো, কারণ ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের আন্দোলন শহরের সীমানা ছাড়িয়ে গ্রাম বাঙলায় অশিক্ষিত ও

অল্প শিক্ষিত মানুষের সমাজে শেকড় গাড়তে পারলোনা। ফলে সংস্কৃত পণ্ডিতদের আধিপত্য কিছুকাল পরে আবার নতুন করে দেখা দিল—নবজাগরণের পরিবর্তে দেখা দিল Revivalism—কেবল ভাষার ক্ষেত্রে নয়, জীবনযাত্রা ও আদর্শবাদের ক্ষেত্রেও। একদিকে অতীত ঐতিহ্যের উপর অন্ধ মমতা অন্যদিকে নব অভিজাত্যের স্মারক হিসাবে (বিশেষ করে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজে) ইংরাজী ভাষার ব্যবহার বাঙালী সমাজে একটি সাংস্কৃতিক বৈপরীত্য সৃষ্টি করলো এবং তা সমান্তরালভাবে চলতে সুরু করলো স্বাধীনতার প্রাক্কাল পর্যন্ত। ফলে জনগণের প্রগতি প্রতিহত হয়ে রইলো বিদ্যাসাগরের আন্তরিক ও অক্লান্ত প্রয়াস সত্বেও। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানকে মাতৃভাষার সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে না পারলে ভারতবর্ষের যুগযুগান্তরের তমসা দূর করা সম্ভব হবেনা—ঘটবেনা জাতির জাগরণ। নৈষ্ঠিক মানবতাবাদী হিসাবে তিনি রামমোহনের মতই এই ভাবনার দ্বারা উদ্দীপ্ত ছিলেন সারা জীবন। অন্ধ জাতীয়তাবাদী হলে একমাত্র সংস্কৃত চর্চার উপর গুরুত্ব অর্পণ করে ভারতীয় ঐতিহ্যের মহিমা প্রচারের পবিত্র দায়িত্ব বহন করে চলতেন—আবার যদি তিনি হতেন তৎকালীন নব্য যুব আন্দোলনের অনুসমর্থক তাহলে একমাত্র ইংরাজী ভাষাকে সর্বোপরে স্থান দিয়ে এবং পাশ্চাত্য জীবনযাত্রাকে অনুকরণ করে সমাজে জলের উপর তেলের মত ভেসে থাকতেন—ফলে একটি কৃত্রিম শ্রেণী প্রস্তুতির কাজে সহায়ক হতে পারতেন মাত্র এবং ব্যর্থ হতেন নব্য যুবকদের মতই। কিন্তু কোনটাই তিনি করেন নি। যথার্থ যুক্তিবাদীর মত এমন একটা সমন্বয়ধর্মী পথ তিনি বেছে নিয়েছিলেন যা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ স্বীয় জীবন সাধনায় প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর মানবতাবাদের যোগ্যতম ধারক ও বাহক হিসাবে।

ঈশ্বরচন্দ্রের সমগ্র জীবন ও কর্মধারা বিশ্লেষণ করলে একথাই প্রতীয়মান হবে যে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন খাঁটি মানবতাবাদী সত্তা নিয়ে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, বাস্তববাদ ও যুক্তিবাদ—এই ত্রিধর্ম তাঁর মধ্যে, ভাবনা সাগর সৃষ্টি করেছিল, তা ছিল যথার্থ পক্ষে মানবতাবাদের সাগর, যেখানে অবগাহন করে পরমহংস দেবের মত মানুষও পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছিলেন। তবে একথা ঠিক যে এই অনন্ত 'সাগর' হঠাৎ সৃষ্ট হয়নি। একদিকে রাজা রামমোহনের পথিকৃতের ভূমিকা, অন্যদিকে তৎকালীন সব মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ডিরোজিওর জেহাদ, এই 'সাগর' সৃষ্টিতে প্রভূত সহায়তা করেছিল। বিদ্যাসাগরের জীবনবোধ ও জীবনাদর্শ একটা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার প্রকাশ—প্রকৃতির খেয়ালীপনায় তাঁর আবির্ভাব ঘটেনি। এ সত্য আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন বিদ্যাসাগরের কাল মূল্যায়ণের সময় যেমন আমরা স্মরণ করি—মার্টিন লুথারের কার্য্যাবলীর বিচারের সময় তৎকালীন ধ্রুপদি ল্যাটিন পণ্ডিতদের ভূমিকার কথা। তবে উভয় ব্যক্তিত্বের পটভূমিকা বিচার করতে বসলে আমাদের একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে বিদ্যাসাগরের জীবন পটে দুটি প্রায় বিভিন্ন ধারার প্রভাব দেখা দিয়েছিল—এক : রামমোহনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বাদ ও ধ্রুপদী শিক্ষার নব মূল্যায়ণ প্রয়াসের প্রভাব, অন্যদিকে ডিরোজিওর কট্টর যুক্তিবাদ ও সংশয়বাদ। দুটি ধারার মধ্যে যথেষ্ট মিল থাকলেও অমিলও ছিল অনেক। ডিরোজিও সংশয় প্রকাশ করেছিলেন তৎকালীন প্রচলিত মূল্যবোধ সম্বন্ধে, ভেঙে-ফেলতে চেয়েছিলেন পুরাতন ঐতিহ্যের ভাবমূর্তি। কিন্তু পরিবর্তে, তিনি কি দিতে চেয়েছিলেন এবং কি দিতে পেরেছিলেন? সেদিক থেকে প্রশ্ন করলে উত্তর হবে নঞার্থক—নেতিবাচক। নতুন পথ সৃষ্টি করতে হলে পথের বাধা আগে দূর করতে হয়। এখানে প্রয়োজন হয় সংশয়বাদের। কিন্তু যেখানে বাধা দূর হোল,

অথচ পথ প্রস্তুত হলনা, সেখানে কাজ থেকে গেল অসম্পূর্ণ। ডিরোজিওর অসম্পূর্ণতা এইখানেই। এই অসম্পূর্ণতার ফলেই তাঁর অনেক নব্যপন্থী শিষ্য হয়ে পড়েছিল বিভ্রান্ত। দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকে নিমচাঁদ, এই বিভ্রান্তে নব্য পুরুষের একটি বাস্তব উদাহরণ যা জীবনবোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ও অসম্পূর্ণতা প্রমাণ করে, প্রয়োজনের সব উপাদানের অস্তিত্ব সত্ত্বেও। কিন্তু ব্যর্থ হোল কেন? এর উত্তর আমরা পাবো রামমোহনের জীবনচর্যায়। রামমোহন তৎকালীন অনেক মূল্যবোধের উপর সংশয় প্রকাশ করেছিলেন—বেদান্তের নবভাষ্য সৃষ্টি করেছিলেন যুক্তিবাদকে করেছিলেন জীবনের হাতিয়ার, যে হাতিয়ারের আঘাতে ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন অনেক বিধিনিষেধ (Taboos) সংস্কারের শৃঙ্খল। কিন্তু ভাঙার কাজের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করেছিলেন নব মূল্যবোধ। ফলে, আমরা পেয়েছিলাম আলোকপ্রাপ্ত ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে—উদ্ভব হয়েছিল উদার জাতীয়তাবাদের পরিপূরক ও অনুপন্থী—পরিপন্থী নয়। তাহলে দেখা যায় রামমোহনের অবদান নঙার্থক ছিলনা। ভাঙার কাজে তিনি দক্ষ হলেও তাঁর ছিল একটা সৃজনীমূলক বা Positive দৃষ্টিভঙ্গী যা তাঁর জীবন দর্শনকে সুদৃঢ় করে তুলেছিল। ডিরোজিওর সংশয়বাদের সঙ্গে রামমোহনের সৃজনীবাদের সমন্বয় ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন ও কর্মের পটভূমিকা হিসাবে কাজ করেছিল। তাই একদিকে যেমন তিনি পুরানো মূল্যবোধকে ভাঙতে দ্বিধা করেন নি, অন্যদিকে তিনি গড়ে তুলেছিলেন নতুন নতুন মূল্যবোধ তাঁর উত্তরসূরীদের জন্য। মানবতাবাদী হিসাবে তাঁর সার্থকতা এইখানেই।

মার্টিন লুথারের জীবনের পটভূমিকায় এমন দুটি প্রায় ভিন্নধর্মী প্রভাবকে ক্রিয়া করতে দেখা যায় না। ধ্রুপদী ল্যাটিন শিক্ষার নব মূল্যায়নের আলোয় সত্যকে যাচাই করার স্পৃহা পেয়ে-

ছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেইসঙ্গে নতুন সৃষ্টিকর্মের অনুকূল আবহাওয়া পেয়েছিলেন হাতের কাছেই। এইজন্য তাঁর কাজ ছিল সহজতর। উপরন্তু লুথার ছিলেন মূলতঃ ধর্মসংস্কারক—জাগতিক ভূমিতে তাঁর পা সজোরে প্রোথিত না রাখলেও চলতো, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের ভূমিকা সেইরূপ ছিলনা। ঈশ্বরচন্দ্র ধর্ম সংস্কারক ছিলেন না, তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারক ও মানবপ্রেমিক তাই তাঁর দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখতে হয়েছিল পার্থিব পৃথিবীতে—প্রতিটি সমস্যাকে সমাধান করতে হোত বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে, দুটি ভিন্নমুখী প্রবাহের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে। যথার্থ বিপ্লবীর কাজত এইখানেই, ভাঙনের সঙ্গে নতুন পৃথিবী গঠনের স্বপ্নের ইঙ্গিত দেওয়া। তিনি কেবল পুরাতন সমাজের পুরানো জায়গাকেই আঘাত দেননি, কেবল বিপ্লবের ইঙ্গিত দিয়েই ক্ষ্যান্ত থাকেননি, তিনি যথার্থ বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন নব নব সৃষ্টির মাধ্যমে। তাই সংশয়ী বিদ্যাসাগর বিশ্বাসীও বটে —নতুনের সৃষ্টিতে বিশ্বাসী। বিদ্রোহের পরিণতি ধ্বংসে নয়, নতুন নতুন সৃষ্টিতে। সেইদিক থেকে বিচার করলে উনবিংশ শতাব্দীর যথার্থ ও সার্থক বিপ্লবী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

মধ্যযুগীয় ইউরোপের নবজাগরণের প্রাক্‌কালে মার্টিন লুথার প্রমুখ অনেক বিপ্লবীকেই আমরা পেয়েছিলাম, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালায় ঈশ্বরচন্দ্রের মত বিপ্লবীর আবির্ভাব একাধিক ঘটেনি। ঈশ্বরচন্দ্রের মূল্যায়ণে এই সত্য স্বীকার না করলে মূল্যায়ণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য কয়েকটি বই :

বাংলার পাঁচজন উপন্যাসিক : গুপ্তপ্রেস ; কলিকাতা

বাংলা সাহিত্যের চতুষ্কোণ : প্রশান্ত মিত্র পাবলিকেশন
শ্রীগুরু লাইব্রেরী ; কলিকাতা

আধুনিক বাংলা কাব্যের সূচনা : এডুকেশন্যাল এন্টারপ্রাইজ ;
কলিকাতা

বিশ শতকের নয়া দর্শন : বিশশতক প্রকাশনী ; কলিকাতা
পরিবেশক—রেণেসাঁ পাবলিশার্স

এই বিহঙ্গেরা (Bilingual) কাব্যসংকলন :
পড়ুয়ামহল প্রকাশনী ; কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান :

১। শৈব্যা পুস্তকালয়—শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট ; কলিকাতা

২। পুস্তক বিপণী—বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট ; কলিকাতা